প্রৈতি

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা
গার্লস স্কুল অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন
২০১৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ।।

যাঁহাতে এই জগৎ নিহিত আছে, যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ পান, আত্মজ্ঞ পুরুষ সেই পরম ধাম (আশ্রম) ব্রহ্মকে জানেন। যে সকল নিষ্কাম পরম পুরুষের উপাসনা করেন তাঁহারা মানবজন্ম অতিক্রম করেন অর্থাৎ তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

আমাদের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা, সতীর্থ (অগ্রজ ও অনুজ) — যাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই, তাঁদের উদ্দেশে আমাদের নিবেদন।

সূচিপত্র

আমাদের কথা		১
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক	নমিতা ভট্টাচার্য	৩
স্বামী বিবেকানন্দের অভিনবত্ব	পূর্বা সেনগুপ্ত	১১
গৈরিক সৈনিক	প্রতিমা মুখোপাধ্যায়	১৪
গুরু ও শিষ্য	অনিতা গুপ্ত	১৬
প্রেমবারি সে যে এনেছে	অপর্ণা মুখোপাধ্যায় অপরাজিতা দাশগুপ্ত ঝরণা ভট্টাচার্য মৌলি ঘোষ সুব্রতা ঘোষ নিয়োগী দেবদত্তা চট্টোপাধ্যায়	২০
বিনোদিনী দাসী : দেড়শো বছরের ধুলোয় ঢাকা মুখ	সুদক্ষিণা ঘোষ	২৬
সুরের সাধনায় দ্বিজেন্দ্রলাল	অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২
সার্ধশতবর্ষের আলোকে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ	মধুমিতা ভট্টাচার্য	৪৮
শতবর্ষে স্মরণে বিস্মরণে সাদাত হাসান মান্টো	ছবি কুণ্ডু	৫০
তোবা তেক সিং	টুপুর চক্রবর্তী (অনুবাদ)	৫২
শতবর্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস	ললিতাগৌরী রায়	৫৬
এস্পেরান্তো একটি ভাষার নাম	মীনা দাঁ	৫৯

হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ৬২

ভগবতী বোস

উমা বোস

রেনু বোস

সুস্মিতা বোস

নিবেদিতা মিত্রবিন্দা ঘোষ ৬৫

পশ্চিমের আকাশে ও মাটিতে পার্বতী চট্টোপাধ্যায় ৬৬

প্রথম আলোর দেশে স্মৃতি মিত্র ৭১

মা রিক্তা মোদক ৭৩

প্রাক্তনী সংসদের সভানেত্রীর প্রতিবেদন ৭৭

প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদিকার প্রতিবেদন ৭৯

Memorandum ৮১

Executive Committee 2010-13 ৮৩

প্রচ্ছদ

তনুজা মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা

সোহিনী ঘোষ মীনা দাঁ

সম্পাদনা সহায়তা

ঝর্ণা সিন্‌হা, অজন্তা ঘোষ (রায়), পৌলোমী বিশ্বাস, মৌমন দত্ত

আমাদের কথা

'ধূমকেতু'। এই বিশেষণটাই কি সর্বাধিক প্রযোজ্য তাঁর সম্পর্কে? তিনি? বিবেকানন্দ। মাত্র উনচল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন তাঁর। 'জীবন' কি মরদেহের স্থায়িত্বের সঙ্গেই সম্পর্কান্বিত? আর কিছু নয়? দেহ ভস্মীভূত হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হলে কী পড়ে থাকে তবে? জীবনী! সেই জীবনী হতে পারে এতটাই বলদৃপ্ত যে সার্ধশত জন্মজয়ন্তী পালন করতে হয় দেশবাসীকে! কী ছিল তাঁর সেই জীবনীতে? প্রিয় শিষ্যা 'নিবেদিতা' মার্গারেট নোব্‌ল তাঁর গুরুর 'কমপ্লিট ওয়ার্কস'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন — 'শাস্ত্র, গুরু ও মাতৃভূমি - যেন তিনটি সুর, এইগুলি মিলিত হয়েই সৃষ্টি করেছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলির মহান সংগীত।' বিবেকানন্দের ধর্মভাবনার পিছনে চালচিত্রের কাজ করেছে পরাধীন ভারতবর্ষ, তার দারিদ্র্য-অশিক্ষা-উদাসীনতা-স্বার্থপরতা সমেত। এটাই ব্যতিক্রম। সাধারণত ধর্মগুরুরা তাঁদের আধ্যাত্মিক জগতের মহামণ্ডলে স্বচ্ছন্দ থাকেন। একাকী। কিন্তু বিবেকানন্দের লড়াই ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধ্যান আর কর্মের ঐক্য বিধানের জন্য। তাঁর কাছে পূর্ণতা শব্দের অর্থ, চতুর্দিকে এবং ব্যক্তির অন্তরে যে পরিব্যাপ্ত ভিন্নতা তার ঐক্যসাধন। এ বড়ো কঠিন পথ! চৈতন্য বলেছিলেন — 'মুচি হয়ে শুচি হয় যে বা হরি ভজে।' বিবেকানন্দ বললেন — 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' বাঙালির আধ্যাত্মিকতার 'জমিনে' 'মানব'-এর নতুন রূপ! সোনা ফলানোর আবাদ! এই আবাদে শক্তি লাগে, সাহস লাগে, অথচ এ-কথা অস্বীকার করারও কোনো উপায় নেই — বিবেকানন্দ ঈশ্বরের সন্ধানী। তাঁর কর্ম, তাঁর ধ্যান, তাঁর উপলব্ধিতে সেই 'এক'-এর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা! নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সংগীতে ধৃত আছে সেই অসামান্য আপাত ভিন্নতা — 'শৌর্য দাও, বীর্য দাও, নবীন জীবন দাও / পরা-অপরা বিদ্যা দাও, দিব্য চেতন দাও।'

উনিশ শতক নবনির্মাণের কাল, নবজাগরণের কাল, নারীশিক্ষার প্রস্তুতি ও বিস্তৃতির কাল। মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্র যখন পুরুষ অধ্যুষিত, বিবেকানন্দ তখন শিক্ষয়িত্রী খুঁজছেন। প্রকৃত অর্থে শিক্ষাগুরু। 'সেবিকা, বান্ধবী, মাতা' একই আধারে না থাকলে কি শিক্ষা দেওয়া যায়? তাঁর উদ্দিষ্ট 'সিংহিনী'-র খোঁজ তিনি পেলেন পশ্চিমে — মার্গারেট নোবলের মধ্যে; গুরুর প্রিয় 'মার্গট'! 'মার্গট' আর 'সংঘজননী' সারদা তাঁর কাছে সবথেকে বেশি গ্রহণীয়। বিবেকানন্দ মনে করতেন — 'মা ঠাকরুণ না থাকলে সর্বনাশ'। স্পষ্টই জানিয়েছিলেন — 'নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও।' যাতে নারী তার আপনভাগ্য নিজেই জয় করে নিতে পারে। আমাদের ধারণায়, সব থেকে বেশি আধুনিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'স্ত্রী-মঠ' স্থাপনের স্বপ্নে। একদল সন্ন্যাসিনী; যাঁরা স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করে মানবকল্যাণে জীবন উৎসর্গ করবে — এই ভাবনার মধ্যেই নারীস্বাধীনতা-ক্ষেত্রটি স্ব-প্রকাশিত হয়েছে।

উনিশ শতকে সমসময়েই জন্মেছিলেন আরও এক দীপ্তিময়ী প্রতিভা — না সমকাল, না উত্তরকাল — কেউই যাঁকে যোগ্য সম্মান দেয়নি — তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্যা — তিনি বিনোদিনী দাসী। 'নটি বিনোদিনী' নামেই যিনি অধিকতর পরিচিত। 'সিংহিনী' মার্গারেট যখন নিজের ঔজ্জ্বল্যেই সমাজের 'লাইম লাইট'-এ, তখন আক্ষরিক অর্থেই মঞ্চ-আলো পড়ছিল বিনোদিনীর মুখে। বঙ্গীয় নাট্যশালা, নাট্যমঞ্চের ইতিহাস তৈরির মূল্যবান নথি প্রস্তুতির অন্যতম উপাদান 'নটী বিনোদিনী'। আমাদের সমাজ তাঁকে ভোগ করেছে, নিজেদের সুবিধার্থে ভাগ করেছে, বিনোদিনী নামের পুষ্পটিকে গুরুমুখী-জ্বালায় উৎসর্গ করে নিজেদের আখেরটি গুছিয়ে

নিয়েছে — কিন্তু তাঁর জন্য কোনো সুখময় অবসরের বন্দোবস্ত করেনি। তাঁর নাবালিকা কন্যাটিকে পর্যন্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। বিনোদিনী কী চান, কাকে চান — এ-সব প্রশ্ন অবান্তর ছিল মঞ্চের শাসকদের কাছে। আর বিনোদিনী? এমনই ছিল তাঁর মঞ্চের প্রতি ভালোবাসা, এমনই ছিল তাঁর সহকর্মীদের প্রতি দায়িত্ববোধ — কিছুটা মমত্ববোধও নয় কি — যে তিনি ভাবলেন না দ্বিতীয়বার, ঠকেছেন জেনেও নীরব থাকলেন — এমনকী মঞ্চ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবার পরও এই নীরব আত্মাহুতিতে নজর দেননি কেউ সমকালে। কিন্তু উত্তরকালের আমরা? আমরাও কি থাকব মৌন? উত্তরে?

রবীন্দ্রনাথের সমসময়েই এসেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রতিভা ও প্রতিভার উত্তরাধিকারে সম্পন্ন এই মানুষটিও সমকাল ও উত্তরকালের উদাসীনতার শিকার। স্বল্প আয়ুর কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে পাল্লা টানা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর লেখা গানগুলিও ছিল লোকের চোখের বাইরে। আজ পর্যন্ত কোনো মান্য গায়নরীতি তৈরি হয়নি। চর্চাও কম। এক সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব — পরে বিদূষণের কারণে কিছুটা ছেদ পড়ে যায়। সেটা বড়ো কথা নয়। মূল কথা হল রবীন্দ্রনাথ থাকলেন সামনে, ঔজ্জ্বল্যে ম্লান হয়ে গেলেন দিজেন্দ্রলাল — সরে গেলেন পেছনের সারিতে। বাংলায় নির্ভেজাল হাসির গান লেখার সর্বাধিক কৃতিত্ব তাঁরই। তার বাইরেও বহু গান আজ বিস্মৃতির আড়ালে, দুঃখের কথা!

দেড়শো বছর আগে মাইহারে জন্মেছিলেন যে সুরের গুরু, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরীরা ক্রমশ বঙ্গদেশকে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লেন বহির্বিশ্বে — তৈরি হল এক অনবদ্য সুরের জাল — যে-সুর গেঁথে ফেলল সমস্ত বিশ্বকে একই মায়ায়। যে-মায়ার দিগন্ত প্রসারী প্রভাব জন্ম দিল সৌভ্রাতৃত্ববোধ। আজকের অশান্ত পৃথিবীকে মায়াবলে শান্ত করার উপায় নিহিত আছে এই সুর-গুরুর মন্ত্রে।

একশো বছর আগে অবিভক্ত পঞ্জাবে লুধিয়ানার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সাদাত হাসান মান্টো। উর্দু গল্পের ভুবনে যাঁর সূর্যের উপস্থিতি। মানুষে মানুষে সীমাহীন বিভেদের চিত্র তাঁর গল্পে। মানুষ 'মানব' না হয়ে কীভাবে 'অবমানব' হয়ে যায় — তার অসামান্য চিত্রণ আমরা দেখি। বিপরীত চিত্রও অবশ্যই। দেশভাগ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও শিল্পী জীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। সে যন্ত্রণা তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে বাকি জীবন, শেষ করে দিয়েছিল তাঁর জীবনী শক্তি। শেষ জীবনের পাকিস্তান-বাস (প্রবাস?) তাঁকে কোনো অর্থেই ঋদ্ধ করেনি। বরং সমৃদ্ধ শিল্পী-জীবনকে করে তুলেছিল রিক্ত।

গত পুনর্মিলন উৎসব থেকে আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিতব্য বহু ঘটনাই ঘটে গেছে — যেগুলির সব উল্লেখ হয়তো সম্ভব হল না 'প্রৈতি'-র ক্ষুদ্র পরিসরে — সেগুলির প্রত্যেকটির জন্য থাকল আমাদের স-শ্রদ্ধ স্মরণ। আর তীব্র নিন্দাবাদ থাকল সেইসব ঘটনার জন্য, যে-ঘটনাগুলি বিশেষত মেয়েদের পক্ষে অবমাননাকর। গণমাধ্যমে উঠে আসা ঘটনাগুলির বাইরেও অহরহ ঘটে চলা অত্যাচার, অবিচার, নৃশংসতাকে আমরা ধিক্কার জানাই। আর প্রার্থনা করি, সমস্ত পৃথিবী থেকে মুছে যাক সমস্ত কালিমা — শোভন হোক, সুন্দর হোক, মধুময় হোক পৃথিবী।

হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক

নমিতা ভট্টাচার্য

৩১ মে ১৮৯৩। তদানীন্তন বোম্বাই বন্দর থেকে 'পেনিনসুলার' জাহাজে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন ভারতীয় এবং আদ্যন্ত বাঙালি এক সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষ সাধুসন্তর দেশ। কিন্তু চির-পরিচিত সাধু সন্ন্যাসীর অভিধায় কি এঁকে সীমায়িত করা যায়? ইনি এক পাগল প্রেমিক, ঘর ছেড়েছেন মানবমুক্তির সন্ধানে। এক অশান্ত যোদ্ধা যিনি দীন দরিদ্র, নিরন্ন, পদদলিত অগণিত স্বদেশবাসীর হতশ্রী অবস্থা মোচনে দায়বদ্ধ। আপাতত গন্তব্যস্থল আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন। World's Columbian Exposition নামক একটি সুবৃহৎ উৎসবের অঙ্গ হিসেবে এই ধর্ম সম্মেলনের আহ্বান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কলম্বিয়ান বিশ্বমেলা ছিল আমেরিকা আবিষ্কারের চারশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আবিষ্কারকের প্রতি জাতির শ্রদ্ধার্ঘ্য। আমেরিকায় তখন পরম ঐশ্বর্য ও গৌরবের যুগ।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট-এ ধর্মমহাসম্মেলনের শুভ সূচনা। ঠিক বেলা দশটায় ইনস্টিটিউট-এ 'হল অফ কলম্বাস'-এ সম্মেলনের উদ্বোধন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দশটি ধর্মের প্রতিনিধিদের সম্মানার্থে দশবার ঘণ্টাধ্বনি হয়। বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত বিশ্বের নানাধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দও মহাসভার বিশাল মঞ্চে উপবিষ্ট। সকলেই আমন্ত্রিত অতিথি। তাঁরা বক্তৃতা লিখিতভাবে প্রস্তুত করে এনেছিলেন। ব্যতিক্রম শুধু স্বামীজি। তাঁর অবস্থা তখন প্রায় কুরুক্ষেত্রে বিচলিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনের ন্যায়। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিজেই বলেছিলেন, 'আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করিনি।' অবশেষে গুরুকে স্মরণ করে উঠে দাঁড়ালেন। সম্বোধনের প্রচলিত রীতি ভেঙে তাঁর উদাত্ত উচ্চারণ, 'Sisters and brothers of America.' মুহূর্তমধ্যে বিশাল হলঘরে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গের প্রবাহ। কয়েক মিনিটব্যাপী সম্মিলিত করতালি ধ্বনি অভিনন্দিত করল আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণহীন ভারতের এই নবীন সন্ন্যাসীকে। তাঁর সম্বোধন বাক্যেই ঘোষিত হয়েছে পরম সত্যটি — সকল মানুষই সম উৎস থেকে জাত, তাই তারা রক্ত সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে সিস্টার নিবেদিতার বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ করা যাক — 'স্বামীজি নারীকে প্রথম স্থান দিয়া জগৎকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।' সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বামীজি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে তিনি এমন এক দেশের এমন এক ধর্মসম্প্রদায় থেকে আগত যা কেবল সকল ধর্মকে সহ্যই করে না, সকল ধর্মকে সত্য বলে মনে করে। দুটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন যার মর্মার্থ হল বিভিন্ন নদী সমূহের উৎস ও গতি বিভিন্ন হলেও যেমন তাদের গন্তব্যস্থল এক — সমুদ্র, তেমনই সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মত ও পথ বিভিন্ন হলেও লক্ষ্যস্থল এক। এ যেন তাঁর গুরুর কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি — যত মত তত পথ!

ধর্মমহাসভায় 'হিন্দুধর্ম' নামে একটিমাত্র লিখিত ভাষণ তিনি পাঠ করেন। হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি না হয়েও হিন্দুধর্মের যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন। বহুযুগ ধরে প্রতীচ্যে বিশেষত খ্রিস্টধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যে বিকৃত ধারণা ও কুৎসা প্রচলিত ছিল তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার স্থান ও কাল হিসেবে তিনি সেদিনের মহাসভার মঞ্চকেই বেছে নেন। তাঁর অব্যর্থ শর সঠিক

নিশানায় পৌঁছে যায়। বজ্রকণ্ঠে চরম বৈপ্লবিক উক্তি উচ্চারিত হয়, 'কে বলে তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের পুত্র — পবিত্র ও পূর্ণ।' শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজি প্রদত্ত ভাষণাবলি অনুধাবন করলে দেখা যায় সব ভাষণেরই মূল কথা ছিল মানুষে মানুষে সাম্যের সুর, মানুষই চরম ও পরম সত্য — প্রচলিত ঈশ্বরবাদ নয়। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মতো হিন্দুধর্ম ব্যক্তি-নির্ভর নয়। ঐ সকল ধর্মের প্রবর্তক-পুরুষ আছেন, হিন্দুধর্মের নেই। হিন্দুধর্মের অবতার প্রোথিত পুরুষেরা বস্তুতপক্ষে আচার্য, যাঁরা তাঁদের জীবন ও বাণীর দ্বারা নিজ নিজ দেশ ও কালকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। কোনো কোনো ধর্ম-সম্প্রদায় উদারতা দেখিয়ে বলে তারা অন্য ধর্মকে 'সহ্য' করে। তাদের কৃপা প্রদর্শনের বিপরীতে স্বামীজির উক্তি — 'আমরা অপর ধর্মমতকে কেবল 'সহ্য' করি না তাদের 'সত্য' বলে স্বীকার করি।' শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের মহান বার্তা বিবেকানন্দ এভাবেই বিপুল বিশ্বমানবসমাজের সামনে মেলে ধরে আহ্বান জানালেন, 'বিস্তার করো নিজেকে, বিস্তারই জীবন সংকোচনই মৃত্যু; প্রেমই জীবন দ্বেষই মৃত্যু'। ২৭ সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার শেষ বক্তৃতায় স্বামীজি অপর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'Help and not Fight; Assimilation and not Destruction; Harmony and Peace and not Dissension.'

স্বামীজির অগ্নিময় বাগ্মিতা ও অসামান্য প্রতিভার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব আবিষ্কার করল এক নতুন ভারতকে যে ভারত পুরোনো হয় কিন্তু কখনও স্থবির হয় না। সেই সনাতন অথচ চিরনবীন ভারতের পুনর্জাগরণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সেনাপতিকে ধ্যানের গুহা থেকে টেনে বার করে 'যুদ্ধক্ষেত্রে' নিক্ষেপ করেছিলেন। সুকঠিন ব্রতে উত্তীর্ণ হয়ে তরুণ সন্ন্যাসী সমগ্র বিশ্বকে শোনালেন মানবমুক্তির নতুন সুসমাচার। সে তো অনেক পরের কথা। সেই গল্পে পৌঁছোনোর আগে আমাদের অনেক পথ পরিক্রমা বাকি। গল্পের নায়কের সঙ্গে ঘুরতে হবে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের উত্তর কলকাতার সিমুলিয়া পল্লির অলিতে গলিতে, খেলার মাঠে, কুস্তির আখড়ায়, দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরের ধূলি-ধূসরিত পথে পথে।

স্বামী বিবেকানন্দর আবির্ভাব ভারতের এক যুগসন্ধিক্ষণে। যখন একদিকে বিজাতীয় সভ্যতার ক্রমাগত আঘাতে ভারতীয় সনাতন সমাজ ক্ষত বিক্ষত, অপরদিকে প্রাচ্য-প্রতীচ্য অবিরত দ্বন্দ্বে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত — সেই ঘোর বিপর্যস্ত সময়ে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি লেনের পিতৃপিতামহের গৃহে ভূমিষ্ঠ হল এক শিশু। আগামী পৃথিবী যাঁকে চিনে নেবে স্বামী বিবেকানন্দ নামে। যিনি নিশ্চিত বাসগৃহের ঠিকানা হারিয়ে ঝড়ের গতিতে বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়বেন। আর তাই প্রতীচ্যে তিনি পরিচিত হবেন Cyclonic Hindu Moule নামে।

স্বামীজির সন্ন্যাস পূর্ববর্তী নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ছেলেবেলায় বিলে, বাল্য ও কৈশোর কেটেছে যার আর্থিক স্বাচ্ছল্যের মাঝে। বৈঠকখানা, বাহির মহল, অন্দর মহল, ঠাকুরদালান নিয়ে চকমিলানো বড়ো অট্টালিকা ছিল আত্মীয়-পরিজনে পূর্ণ। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন সফল আইনজীবী। যথেষ্ট অর্থোপার্জন করা সত্ত্বেও অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তি ছিল যাঁর জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্য। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্বময়ী ও ধর্মপ্রাণ মহিলা, প্রতিদিন শিবপুজো না করে যিনি জলস্পর্শ করতেন না। বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর মোট চার পুত্র ও ছয় কন্যা। এদের মধ্যে এক পুত্র ও দুই কন্যা শৈশবেই মারা যায়। পুত্র সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের চেয়ে সাড়ে ছয় বছরের বড়ো এবং কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার থেকে প্রায় সাড়ে সতেরো বছরের ছোটো। নরেন্দ্রনাথের এক দিদি হারামণি এবং দুই বোন কিরণবালা ও যোগেন্দ্রবালা স্বল্পায়ু ছিলেন। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের স্বামী বিবেকানন্দরূপে সামগ্রিক উত্তরণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর এক দিদি স্বর্ণময়ী দেবী আর দুই ভাই মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয় দত্তবাড়ির নিজস্ব পাঠশালায়। সেখানেই বাল্য ও কৈশোরের পাঠ নেওয়া। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম বর্ষের বালক নরেন্দ্রকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচালিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের তৎকালীন নবম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়। বিদ্যালয়ের পাঠান্তে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'সাধারণ বিভাগে' নরেন্দ্রনাথ প্রবেশাধিকার লাভ করেন। কিন্তু প্রথম বর্ষের শেষে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় কলেজে বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতির হার কম থাকার কারণে যথাকালে এফ. এ. পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি প্রাপ্তি বিষয়ে গোল বাধার সম্ভাবনা দেখা দিল। তাই তিনি বাড়ির নিকটবর্তী জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) ভর্তি হলেন। এখানে পরীক্ষাদান বিষয়ে কোনো আপত্তি উঠল না। এই অধ্যায়ের আয়ুষ্কাল চার বৎসর। বি. এ. পাশ করার পর নরেন্দ্রনাথ অল্প কিছুদিনের জন্য মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। সে-সময়ে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় মানুষটির সন্ধানে এই স্কুলের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন!

ছেলেবেলায় মায়ের আদরের বিলে ছিল আর পাঁচটা শিশুর মতোই প্রাণচঞ্চল, দুরন্ত। সঙ্গী সাথীদের অবিসংবাদিত নেতা। যার নিত্য নতুন খেলার মধ্যে ছিল ধ্যান ধ্যান খেলা! তবে ও খেলা আর খেলার পর্যায়ে থাকত না, যখন দেখা যেত ধ্যানতন্ময়তার কারণে নিকটে সাপের উপস্থিতিও সে টের পেত না। দীন দরিদ্রের জন্য তার আকুলতা লক্ষ করা গেছে শিশু বয়স থেকেই। স্বল্প বস্ত্র পরিহিত ভিখারি দেখলে ছোট্ট বিলে মায়ের অনুমতির অপেক্ষা না করেই জানালা দিয়ে বস্ত্র দান করত। সচ্ছল পরিবারের বুদ্ধিদীপ্ত শিশুরা যেভাবে বেড়ে ওঠে তার ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। বিদ্যাচর্চা, সংগীত শিক্ষা, শরীর চর্চা, কুস্তি শেখা সবই একসঙ্গে চলছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল অনুসন্ধিৎসা তাকে অস্থির করে তুলত। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভাবী প্রথিতযশা দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও অধ্যয়ন করতেন। ইনি উপরের শ্রেণির ছাত্র হলেও যুবক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হত এবং মাঝে মধ্যে উভয়ে দার্শনিক আলোচনাও করতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাক্ষ্যমতে যুবক নরেন্দ্রনাথ ছিলেন 'প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, জন্ম বিদ্রোহী কালাপাহাড়, বুদ্ধিতে সৃষ্টিশীল, প্রচণ্ড প্রভাবশালী, মানুষকে অক্লেশে বশীভূত করতে সমর্থ।'

প্রখর যুক্তিবাদী আদ্যন্ত তার্কিক যুবক নরেন্দ্রনাথকে সুকোমল ভাবময়, আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প-শিক্ষিত ভগবৎপ্রেমে অর্ধোন্মাদ শ্রীশ্রীঠাকুর কীভাবে বশীভূত করেছিলেন সে এক রহস্য। এ-সম্পর্কে স্বয়ং বিবেকানন্দ বলেছেন, 'কোনোদিন জানা যাবে না — তা বিলীন হয়ে যাবে আমার দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই।' নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে রূপান্তরের ইতিহাস বিস্ময়কর, প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষাদানের নানা বিবরণ লীলাপ্রসঙ্গ বা কথামৃতের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে। নরেন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ মানবমহিমা সম্পর্কে অবহিত করছেন এই বলে, 'মানুষ কি কম গা! এই মনুষ্য শরীরেই চরম উপলব্ধি হয়।' তাঁরই শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন মানুষে মানুষে ভেদবোধ হল চূড়ান্ত কুসংস্কার। এরই ফলস্বরূপ আমরা পরবর্তীকালে পাই সাম্যবাদের মহান উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দকে। এই প্রসঙ্গ স্বামীজির স্বমুখেই শোনা যাক, 'যেদিন থেকে রামকৃষ্ণ জন্মেছেন,

সেদিন থেকে সব ভেদ উঠে গেল — মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-অপণ্ডিতের ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ, হিন্দু-মুসলমান-ক্রিশ্চান ভেদ — সব চলে গেল।'

পিতার মৃত্যুর পরে যখন নিরন্ন নরেন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরছেন অন্ন-সংস্থানের সন্ধানে তখন তাকে নির্মম ক্ষুধাসত্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিষ্ঠুর নির্মম উচ্চারণ — 'নরেন্দ্র খেতে পাচ্ছে না, তা ভালোই হল। এবার ও অপরের পেটের জ্বালা কাকে বলে তা বুঝবে।' বিবেকানন্দর নির্মাণ প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন।' তিনি আরও বলেছেন — 'বিবেকানন্দর স্বদেশ প্রেমিকতা তাঁহার পূজ্যবাদ গুরুদেবেরই দান।' দক্ষিণ ভারত প্রবজ্যাকালে মহাবালেশ্বরে লিমডির ঠাকুর সাহেবকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'একটা অদ্ভুত শক্তি আমাকে জোর করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর আমার কাঁধে এক মহান কর্মভার অর্পণ করে গিয়েছেন। যে পর্যন্ত না তা শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই।' লোকশিক্ষক, প্রচারক ও বিশ্বাচার্যরূপে স্বামীজির আত্মপ্রকাশ বিবেকানন্দ নির্মাণ প্রক্রিয়ারই পরিণতি।

বিবেকানন্দর শিকাগো-ভাষণের বিরাট প্রতিক্রিয়ার সংবাদতরঙ্গ যখন ভারতবর্ষের বুকে আছড়ে পড়ল তখন তাতে বিপুলভাবে আলোড়িত হল গোটা ভারতবর্ষের মানুষ। এক ধাক্কায় এক ঘুমন্ত দেশ জাগ্রত হয়ে উঠল। পাশ্চাত্যের মনীষার এক উল্লেখযোগ্য অংশ সেই প্রথম প্রকাশ্যে স্বীকার করল সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, চিন্তা ও ভাবনায়, আদর্শ ও সাধনায় ভারতের অবস্থান পাশ্চাত্যের চেয়ে অনেক উঁচুতে। পরাধীন ভারতের পক্ষে যা ছিল অভাবনীয়, অকল্পনীয় — বিবেকানন্দ তাই ঘটালেন। তিনি সম্পন্ন করলেন তাঁর গুরুদেবের ব্রত। উত্তোলন করলেন স্বদেশকে, সক্রিয় করলেন ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতাকে। আঠারো-উনিশ বছরের নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে বলতেন যে তার মধ্যে রয়েছে জগৎ আলোড়নকারী বিপুল শক্তি। রোগযন্ত্রণায় দুঃসহ মুহূর্তে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে একখানি কাগজে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখে দিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবি।' বিদ্রোহীর কণ্ঠে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি ও সব পারব না।' সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোর হাড় (ঘাড়?) করবে।' গুরু ও শিষ্যের এই সংঘর্ষ হয়তো গুরুর দেহান্ত পর্যন্তই চলেছিল। গুরু জানতেন বিরাট এক যুগান্তকারী 'মিশন' সম্পাদন করার জন্য শিষ্য দৈব-নির্দিষ্ট।

বরানগর মঠে শ্রীমা-কে পুরোনো কথার রোমন্থন করে নরেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পাগলের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'তুই কী চাস?' আমি বললাম, 'আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচ-ছয় দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।' তিনি তিরস্কার করে বললেন, 'ছি ছি, দুই এত বড়ো আধার, তোর মুখে এই কথা? আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস? এতো অতি তুচ্ছ হীনকথা।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রতিক্রিয়ায় নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিলেন। কারণ ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার যে ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল তাতে তিনি বুঝেছিলেন যে, ঈশ্বর দর্শন, আত্মমুক্তি, নির্বিকল্প। সমাধিলাভ সাধকের জীবনে পরমপ্রাপ্তি। কিন্তু এখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি শুনলেন যে, শুধু ঈশ্বরদর্শন, আত্মমুক্তি এবং নির্বিকল্প সমাধিলাভ অথবা নিজমুক্তির জন্য লালায়িত হওয়াও এক ধরনের স্বার্থপরতা। এর আগেই

দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তিনি শুনেছিলেন সেই বৈপ্লবিক বাণী, 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা,' যা তাঁর সম্মুখে এক অসাধারণ সত্যকে উন্মোচিত করেছিল। সেদিনই তিনি সংকল্প করেছিলেন ভবিষ্যতে 'এই অদ্ভুত সত্য'-কে জগতে প্রচার করবেন, 'বনের বেদান্ত'-কে ঘরে পৌঁছে দেবেন। তিনি অনুভব করলেন সন্ন্যাসের ও ধর্মের এবং যাবতীয় আধ্যাত্মিক প্রয়াসের মানবিকীকরণ ও সামাজিকীকরণ চাই। যদি সমষ্টি মানুষ ক্ষুধা, পীড়া ও অজ্ঞানের দ্বারা কবলিত থাকে, সে-ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মানুষের উর্ধায়ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা শুধু চূড়ান্ত স্বার্থপরতাই নয়, চূড়ান্ত পাপও।

ভাবী বিবেকানন্দর গঠন ও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে পরিব্রাজক হিসেবে তাঁর ভারত পরিক্রমার প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। গুরুর মহাপ্রয়াণের পর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বরানগর মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এরপর তপস্যা ও বৈরাগ্যের দুর্বার প্রেরণায় তিনি প্রবজ্যায় যাত্রা করলেন। গন্তব্য-স্থল কাশী। এই তীর্থ দর্শনকালে তিনি ভারতাত্মার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছিলেন ও বহু বিচিত্র মতবাদেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। চকিতে তাঁর মনে দুঃস্থ ও নিপীড়িতদের দুঃখমোচনার্থ কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার অভিলাষ জাগত। দ্বিতীয়বার ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি পরিক্রমা করেন কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ও হৃষীকেশ। এবারের পরিক্রমার বিশেষত্ব প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন, 'এই পর্যটনকালেই বিবেকানন্দর সম্মুখে প্রাচীন ভারত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল — সেই সনাতন শাশ্বত ভারত, সেই বৈদেশিক ভারত, সেই ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তির গৌরবে মণ্ডিত, অসংখ্য বীর ও অগণিত দেবতার ভারত; সেই দ্রাবিড়, আর্য ও মোগলের ভারত, মিলিত ভারত।' এই প্রবজ্যাশেষে তিনি মঠে ফিরে আসেন এবং ১৮৮৯ এর ডিসেম্বরের শেষ তপস্যার উদ্দেশ্যে বরানগর মঠ ছেড়ে আবার রওনা দিলেন। প্রথমে বৈদ্যনাথ এবং পরে এলাহাবাদ হয়ে তিনি ১৮৯০-এর জানুয়ারি মাসে এসে উপস্থিত হলেন গাজিপুরে। সমকালের বিখ্যাত সিদ্ধ যোগী পওহারীবাবা গাজিপুরে তাঁর নির্জন গুহায় বাস করতেন। পওহারীবাবার সাথে পরিচিত হয়ে স্বামীজি এতই মুগ্ধ হন যে স্থির করেন তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে যোগ সাধনায় ব্রতী হবেন। সেইকালে শ্রীরামকৃষ্ণের চকিত আবির্ভাব ও অকথিত বাণী তাঁকে সঠিক দিশার সন্ধান দেয়। ১৮৯০-এর এপ্রিলে স্বামীজি বরানগর মঠে ফিরে এলেও ১৮৯০-এর জুলাই মাসের মাঝামাঝি আবার প্রব্রজ্যায় বের হলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। এবার লক্ষ হিমালয়। অন্যান্য সন্ন্যাসীর মতোই তাঁর এই যাত্রা ছিল ভগবানের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা। ১৮৯০ এর মাঝামাঝি স্বামীজি এলেন মীরাটে। তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে তাঁর কয়েকজন গুরুভ্রাতাও এই সময়ে মীরাটে একত্রিত হয়েছিলেন। একদিন সকলকে ডেকে স্বামীজি বললেন, 'আমার জীবনব্রত স্থির হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে আমি একাকী অবস্থান করব। তোমরা আমায় ত্যাগ করো।'

মীরাট থেকে শুরু হল স্বামীজির নিঃসঙ্গ নতুন পরিক্রমা। দণ্ড কমণ্ডলু হাতে কখনো বিবিদিষানন্দ, কখনো সচ্চিদানন্দ, কখনো বিবেকানন্দ নামের আড়ালে নিজের পরিচয় গোপন রেখে এগিয়ে চললেন তিনি। প্রথমে দিল্লি হয়ে রাজপুতানার পথ ধরলেন। এই পরিক্রমা বিবেকানন্দর ভারত পরিক্রমার শেষ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পর্ব। এটি সাধারণ অর্থে কোনো আধ্যাত্মিক পরিক্রমা ছিল না। হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে এই প্রথম একজন সন্ন্যাসী ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষের সন্ধানে পরিক্রমা করলেন। তাঁর এই পরিক্রমার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল কন্যাকুমারীতে আর পরবর্তী পর্ব শিকাগোয়। এই প্রবজ্যা প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখেছেন, 'এ ছিল এক মহানিষ্ক্রমণ। তিনি ডুবুরির মতো ভারতের মহাসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভারতের মহাসমুদ্রই তাঁহার পথরেখাকে

নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল।' একেবারে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী — শত শত যোজনব্যাপী এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে এসে পৌঁছেছিলেন ১৮৯২-এর ২৪ ডিসেম্বর। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন ভারতের মাটি ও মানুষের সঙ্গে। একদিকে দেশীয় রাজা ও ধনী সদাশয় ব্যক্তিদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন আবার দরিদ্রতম ব্যক্তির পর্ণকুটিরও তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। এভাবেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ভারতাত্মার সঙ্গে। ভারতের অন্য কোনো মহামানব, দেশপ্রেমিক, রাষ্ট্রনায়ক, সংস্কারক অথবা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে এভাবে দেশের আপামর জনগণ ও ধূলিকণাকে চিনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত হীন অবস্থা, ধর্মের বিকৃতি, নারীজাতির প্রতি সমাজের অপরিসীম উপেক্ষা ও অসম্মান। বেদনামথিত হৃদয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী রূপান্তরিত হলেন পাগল প্রেমিকে, মানবপ্রেমিকে, দেশপ্রেমিকে এবং সর্বোপরি বিশ্বাচার্যে। ভারতের সর্বশেষ সমুদ্রশিলায় সাঁতার কেটে উপস্থিত হয়ে ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বর — তিনদিন, তিনরাত্রি ধ্যান করেছিলেন। তাঁর সেই ধ্যান ঈশ্বরের ধ্যান ছিল না, ছিল আসমুদ্র হিমাচল ভারতের ধ্যান। ধ্যানের স্বচ্ছ আলোকে তিনি পাঠ করলেন ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কোন পথে ভারত তার অতীত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বর্তমানে কেন তার এই অধঃপতন, কোন পথে আবার ভারত ফিরে পাবে তার হৃত গৌরব। এভাবেই আত্মমুক্তিকামী সন্ন্যাসী রূপান্তরিত হলেন মানবমুক্তিকামী প্রেমিকে। ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক বিবেকানন্দ-র নির্মাণ সম্পূর্ণ হল। ভারত পরিক্রমাকালে জুনাগড়, পোরবন্দর, মহাবালেশ্বর এবং মহীশূরে অনেকেই স্বামীজিকে আমেরিকার শিকাগোয় আসন্ন ধর্মমহাসভায় যোগদান করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর মনেও কখনো কখনো সে ইচ্ছা জেগেছে কিন্তু তা কখনও সংকল্পে রূপ নেয়নি। তা রূপ নিল কন্যাকুমারীতে। ধ্যানোত্থিত সন্ন্যাসী সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি যাবেন আমেরিকার ধর্মমহাসভায়। পৃথিবীর নবীনতম সভ্যতার লীলাভূমিতে পৌঁছে দেবেন পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার পীঠভূমির বাণী। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে তুলে ধরবেন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে একটি সহিষ্ণু জাতির উপর কঠিনতম উৎপীড়ন চালিয়েছে তার ইতিহাস। এতে একই সঙ্গে দুটি কাজ হবে — পাশ্চাত্য আবিষ্কার করবে ভারতবর্ষকে আর ভারতবর্ষ নতুন করে আবিষ্কার করবে নিজেকে, যে আবিষ্কার সূচনা করবে তার পুনর্জাগরণের। এর পরবর্তী অধ্যায় তো ইতিহাস!

অনন্ত দুঃখ বহন করার ক্ষমতারই অন্য নাম যদি হয় প্রতিভা, তাহলে বিবেকানন্দর মতো এমন প্রতিভাধর পুরুষ পৃথিবীতে জন্মেছেন ক-জন? 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' মানবকল্যাণের জন্য জীবন-যৌবন-ধন-মান সবকিছুই আহুতি দিয়ে গেছেন। পুরাণের দধীচির মতোই এই নীরব নিঃশর্ত আত্মদান। স্বামীজির নিজের রচিত 'সখার প্রতি' কবিতার কয়েকটি পংক্তি এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় — 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়। হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান; লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মুরতি তা কি সহ? হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল — সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে সংসারে স্থান।'

বেদনামথিত হৃদয়ে নিজের উদ্দেশেই যেন বিবেকানন্দ-র এই সকরুণ উচ্চারণ। মহাজীবনের এই পবিত্র অভিযাত্রীকে নিঃশেষে প্রাণদান করার আগে যে-পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে সে-পথের ক্লেশ, দুঃখ, যন্ত্রণা তাঁর মতো অসাধারণ পুরুষ ছাড়া কেউ সহ্য করতে পারে না। মানবমুক্তির প্রয়োজনে প্রেমের শতদল সযত্নে সংরক্ষণ করে অনন্ত দুঃখযন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছেন। পীড়িত, আর্ত, দীন, দুঃখীর জন্য তাঁর হৃদয় বেদনার কথা মাঝে মাঝে প্রকাশ করে ফেলতেন গুরুভাইদের কাছে। তেমনই এক মুহূর্তে বলেছিলেন, 'হরি ভাই, এত তপস্যাদি

করলুম। তবু ধর্ম-টর্ম তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। তবে দেখছি ভারত ভ্রমণ করে আমার হার্ট খুব বেড়ে গেছে। দেশের দীন দুঃখীদের জন্য প্রাণটা কাঁদছে। সকলের জন্য খুব ফিল করছি। তাই আমেরিকায় যাচ্ছি। দেখি, এদের জন্য সেখানে কী করতে পারি।'

সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে স্বামীজির সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণার সূত্রপাত ঘটে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর। তিনি জানতে পারেন পিতৃদেব কিছুই রেখে যেতে পারেননি সংসারের ভরণপোষণের জন্য বরং প্রচুর ঋণের দায় রেখে গেছেন পুত্রদের জন্য। বিষয়সম্পত্তি বিভাগের মকদ্দমা শুরু হয়েছিল বিশ্বনাথ দত্ত-র জীবদ্দশাতেই। স্ব-গৃহচ্যুত নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন ভাড়াবাড়িতে থেকে পরে মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে মাতামহীভবনে আশ্রয় নিলেন। সে সময়কার হৃদয়বিদারী যন্ত্রণার বিবরণ তাঁর স্ব-মুখেই শোনা যাক : 'মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে ছিন্ন বস্ত্রে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অফিস হইতে অফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু সর্বত্রই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল।' তাঁর দুপাশে তখন দুটি জগৎ। একদিকে তাঁকে দেখতে হচ্ছিল যে তাঁর মা ও ভাইয়েরা অনাহারে মরণাপন্ন, অপরদিকে অন্তর থেকে ডাক অনুভব করছেন গুরুদেবের আদর্শ ভারত ও সমগ্র বিশ্বে প্রচারের ও বাস্তব রূপায়ণের। সুতরাং তাঁর মনের মধ্যে চলছিল নিরন্তর সংগ্রাম ও তার দুঃসহ যন্ত্রণা। শেষ পর্যন্ত অন্তরের ডাকেই তিনি সাড়া দিলেন। সংসার ত্যাগের পরে গুরুভাইদের নিয়ে আশ্রয়হীন অবস্থায় ভিক্ষান্ন মাত্র সম্বল করে অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যায় দিন কাটানোর সময় কত রকমের অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে তার মর্মন্তুদ সাক্ষ্য বহন করে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা শেক্সপিয়ার ক্লাবে স্বামীজি প্রদত্ত 'আমার জীবন ও ব্রত' নামক বক্তৃতাটি — 'মাত্র দ্বাদশজন বালক লোকের কাছে বড়ো বড়ো আদর্শের কথা বলছে। বলছে যে তারা সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করতে দৃঢ় সংকল্প। সেকথা শুনে সবাই উপহাস করত। আমাদের উপর রীতিমত অত্যাচার শুরু হল...। কখনো রাত্রি নয়টায় একবেলা আহার, কখনো ভোর আটটায় একবেলা আহার, তাও আবার তিনদিন পরে এবং সর্বদাই অতি সামান্য কদর্য অন্ন। পরিণামে শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।'

শিকাগো বিজয়ের পরে সমগ্র চিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী উন্মাদনা ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' লিখল : 'ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দই অবিসংবাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।' অ্যানি বেসান্তের মন্তব্য : 'সন্ন্যাসী তাঁর পরিচয় নিশ্চয়ই কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী তিনি। প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চাইতে সৈনিকই বেশি মনে হয়। দেশ ও জাতির অভিমান ও গৌরব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়।' ধর্মমহাসভার শ্রোতৃমন্ডলী এবং প্রায় সমগ্র আমেরিকা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করল আজন্ম সম্রাট বিবেকানন্দ-র উদ্দেশে। পরাধীন দেশের এক প্রতিনিধি কালো হিদেনের এই সম্মান প্রাপ্তি অসহ্য বলে মনে হল খ্রিস্টান পাদরিদের কাছে আর ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতায় জ্বলে উঠল ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ ও থিওসফিস্ট নেতৃবৃন্দ।

সে-সময়ে স্বামীজি সম্পর্কে যে কুৎসা ও অপপ্রচার চলছিল তার পিছনে তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দজি : (১) ঈর্ষা, (২) স্বার্থে বিঘ্ন, (৩) স্ব-মত প্রতিষ্ঠায় বাধা। ব্রাহ্মসমাজ ও থিওসফিক্যাল সোসাইটির যে প্রতিপত্তি পূর্বে আমেরিকায় ছিল, স্বামীজির অকস্মাৎ অভ্যুদয়ে তা অনেকটা ম্লান হয়ে গেল। ব্রাহ্ম নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বদেশে ফিরে বিবেকানন্দ-র নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। খ্রিস্টান পাদরিদের প্রচার প্রণালীর নিন্দা করায় তাঁরা স্বামীজিকে চরিত্রহীন, লম্পট, মদ্যপ, নীতিভ্রষ্ট বর্জনীয় ব্যক্তি বলে সর্বত্র প্রচার

চালাচ্ছিলেন। ভারতের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিবেকানন্দ বিরূপতার প্রধান তিনটি কারণ হল — (১) সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ-এর সমুদ্রযাত্রা, খাদ্যাখাদ্য বিচারহীনতা, ম্লেচ্ছের হাতে অন্নগ্রহণ এবং (৩) অব্রাহ্মণ হয়ে সন্ন্যাসগ্রহণ। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত স্বামীজির তখন একটাই চিন্তা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছেলের সম্পর্কে এত নিন্দা ও কুৎসা কানে গেলে তাঁর দুঃখিনী গর্ভধারিণী মাতা কেমন করে জীবন ধারণ করবেন।

প্রায় দু-দশকব্যাপী অবিশ্বাস্য পরিশ্রম, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ঝড়ের গতিতে প্রতীচ্য পরিক্রমা ও বক্তৃতা প্রদান — এ-সবের ফলস্বরূপ অকালেই স্বামীজির সুস্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। শরীরে নানা ব্যাধি বাসা বাঁধল যদিও কোনোদিনই তিনি মনোবল হারাননি। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই শুক্রবার স্বামীজির মহাপ্রয়াণ। আয়ুর মাপে মাত্রই ৩৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিনের ছোট্ট একটা জীবন। কীর্তির মাপে সে-জীবন এত বড়ো যে তাকে মাপা যায় না, আজও মাপা যায়নি। মহাযোগী, মহাযোদ্ধা আজীবন অমিত বিক্রমে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, শোষণ, নিপীড়ন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে অবশেষে অবসন্ন সেনাপতির ন্যায় নেতৃত্ব ভার গুরুভাইদের উপর অর্পণ করে নির্ভার হলেন। দুরন্ত শিশুটি যেন ক্লান্ত হয়ে জগজ্জননীর কোলে শ্রান্ত মাথাটি রেখে নিশ্চিন্ততার আশ্রয় চাইছে। তাঁর স্বরচিত 'কালী দি মাদার' (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত) কবিতার শেষ পংক্তি ক-টিতে যেন এরই আভাস পাওয়া যায় :

মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।

জগজ্জননীর চির অশান্ত সৈনিক সন্তান পরম নির্ভরতায় পরম প্রাপ্তি হিসেবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। এ যেন তাঁর ইচ্ছামৃত্যু। তাঁর সেবক ব্রহ্মচারীরা এবং মঠে উপস্থিত অন্যান্য সন্ন্যাসীরা মনে করলেন স্বামীজি সমাধিস্থ হয়েছেন। তাঁকে সমাধি অবস্থা থেকে জাগতিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সবাই জোরে জোরে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শোনাতে লাগলেন। কিন্তু এ সমাধি তো ভাঙার নয়। স্বামীজি যে মহাসমাধিতে বিলীন হয়ে গেছেন। নিঃশব্দে নির্বাপিত হল এক মহাজীবনের অনির্বাণ দীপশিখা।

অতিথি কলম

স্বামী বিবেকানন্দের অভিনবত্ব

পূর্বা সেনগুপ্ত

আজ আমরা একটি ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ তম জন্মবর্ষ। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক জগতে যে জাগরণ এসেছিল সেই জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের অভিনবত্ব কী ছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে আজকের যুগে, আজকের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে স্বামী বিবেকানন্দের অভিনবত্ব কোথায়?

প্রথমেই এ-কথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ গড়ে উঠেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ বিরাট আধ্যাত্মিক ছায়ায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যা সাধন করে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন তা প্রচার করেছেন বিবেকানন্দ। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে এই প্রচারের ভঙ্গিমা ছিল একেবারে অভিনব। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ গোপনে কী সাধনা করে গেলেন, কী তাঁর মূল্য, কী তাঁর মর্মবাণী এ-কথা বুঝে উঠতে পারা কোনো সাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বামীজির অভিনবত্ব কোথায় তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব। এই ঘটনাটি সকলেরই জানা। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ছোটো ঘরটিতে বসে সমাধিস্থ অবস্থায় বলে উঠলেন, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন ও নামে রুচি — বৈষ্ণবগণ এই তিন উপায়ের মাধ্যমে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই তিনটির কথা উচ্চারণ করে, নিজেই আবার বললেন, 'জীবে দয়া কি? তুমি কীটানুকীট তুমি জীবকে দয়া করবে কি? বলো, শিব জ্ঞানে জীব সেবা!' — বৈষ্ণবভাবনার থেকে সরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' — উক্তির মাধ্যমে যে একটি নতুন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করলেন এ-কথা কিন্তু তৎক্ষণাৎ কেউ-ই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। অনেকেই সেই ছোটো ঘরটিতে উপস্থিত ছিলেন, অনেকের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন যুবক নরেন্দ্রনাথ। সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে একমাত্র নরেন্দ্রনাথের মুখে শোনা গেল, 'আজ এক নতুন কথা শুনলুম, যদি ঠাকুর দিন দেন তো সমগ্র জগৎকে এই কথা শোনাব।' শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ছোটো কথাটি যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কাছে জপমন্ত্র হয়ে উঠবে, সেই ছোট্ট কথাটি যে মানবসভ্যতাকে ভিন্ন মাত্রা এনে দেবে — এ-কথা একমাত্র নরেন্দ্রনাথই বুঝতে পেরেছিলেন। কেবল বুঝতে পারা নয়, সেটিতে তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাও নরেন্দ্রনাথ, পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের অবদান। শিব জ্ঞানে জীব সেবা কেবল কতগুলি কথা নয় — এটি হল একটি জীবনপদ্ধতি। যে জীবনপদ্ধতি মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ঈশ্বরের সাধনায় রূপান্তরিত করে। এই ধূলা মলিন পৃথিবীকে করে তোলে স্বর্গ, সর্বক্ষণের পূজার অর্ঘ্য হল তারই প্রতিদিনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজ। বৈষ্ণবভাব থেকে সরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি নতুন ভাব প্রকাশ করলেন, বিবেকানন্দ তার তাত্ত্বিক রূপ দান করলেন। যে তত্ত্বের নাম হল 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'। তিনি দেখালেন বেদান্তের একত্বের কথা এতদিন আমরা কেবল উচ্চারণ করতাম কিন্তু এখন সেই একত্বকে প্রতিদিনের কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। দৈনন্দিন জীবনচর্যার অঙ্গ করা যায়। বনের বেদান্তকে ঘরে

আনলেন তিনি। পূজার স্থান আর শুধু হিমালয়ের গুহার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, তা ছড়িয়ে গেল কুটিরে কুটিরে! প্রতিটি ঘরের অন্দরমহলে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদত্ত ভাবকে একটি তাত্ত্বিক রূপ দান করা স্বামী বিবেকানন্দের অভিনব অবদান।

অভিনবত্ব ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই। জন্মক্ষণ থেকেই তিনি বিশেষ মনোযোগের পাত্র! অন্য সকলের চেয়ে আলাদা, অন্য সকলের চেয়ে কাম্য! যা দেখব, যা জানব — তাকে চোখ কান বুজে গ্রহণ করব না। প্রতিটি বিষয়কে যাচাই করে নিতে হবে, পরীক্ষা করে বুঝে নিতে হবে — যা বলা হচ্ছে তা সঠিক কিনা! ছোটোবেলা থেকেই চারিদিকে একটি বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখতে পান নরেন্দ্রনাথ! সকলেই ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতপাতের জন্য ভীত থাকেন। কখন সেই জাত নামক বস্তুটি পালিয়ে যায়, চলে যায়! — ছোটো বিলের মনে এ এক প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। জাত জিনিসটি যায় কী করে? কেউ কি তাকে যেতে দেখেছে? জাত চলে গেলে কী রকম লাগে! — এইসব কঠিন প্রশ্ন তাঁকে বিঁধত! তাই আমরা দেখি অত্যন্ত ছোটো বয়সে, তিনি পিতা বিশ্বনাথ দত্তের অফিসে রক্ষিত বিভিন্ন জাতের জন্য বিভিন্ন হুঁকোতে টান দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন, জাত যায় কী করে! এই যাচাই করে নেওয়ার মহৎ গুণটি তাঁর চরিত্রের অভিনবত্ব। পরবর্তীকালে আমরা দেখি বিভিন্ন দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী নরেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে সেই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে যা তৎকালের অন্য কোনো ধর্মপ্রচারকের মনে দেখা দেয়নি। সেই প্রশ্নটি হল, সত্যি কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হয়ে ধর্মমত প্রচার ও প্রসারে ব্যস্ত। রাজা রামমোহনের পর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মকে নতুনভাবে, নতুন ছাঁদে পরিবেশন করছেন। কিন্তু এঁরা কি ভগবানকে দেখেছেন? ঈশ্বরদ্রষ্টা কি তাঁরা? এই প্রশ্ন কেবল নরেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে উত্থাপিত হল না, তিনি এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে অস্থির হয়ে উঠলেন, চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি এতটাই ব্যাকুল হয়েছিলেন যে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনি যে ঈশ্বরের কথা এত বলেন, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?' আমরা জানি এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদান করতে অক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরই নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যুগের মানুষ যখন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছিল, যখন তাঁরা অপরের কথামতো কেবল কাজ করতেই, বা অপরের কথা মেনে নিতেই অভ্যস্ত ছিল, সত্যসন্ধানের কোনো প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে ছিল না, সেই যুগে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ সত্য সন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তৎকালে নাকি যথার্থ শাস্ত্রে বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে কী আছে তা লোকে জানতে চেষ্টা করত না। পুরোহিত-তন্ত্র মানুষের শোষণের যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শোনা যায় তখন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সত্যনারায়ণের পাঁচালি পাঠ করা হত। কোনটি সামাজিক বিষয়, আর কোনটি ধর্মীয় বিষয় — এই দুয়ের মধ্যে ফারাক মানুষ করতে অক্ষম ছিল। তাই জাতি ব্যবস্থা, ছুঁৎমার্গ ক্ষতের মতো আমাদের সমাজ-শরীরে বাসা বেঁধেছিল। স্বামীজি মূল শাস্ত্র পাঠ করে, হিন্দু বা সনাতন ধর্মের মধ্যে কী আছে — তা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে পাঠ করে, নিজে অনুধাবন করেই মানুষকে সত্যবস্তুটির সন্ধান দিয়েছিলেন। যেমন জাতি ব্যবস্থা, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যখন এই জাতি-ব্যবস্থাকে ধর্মীয় বন্দোবস্ত বলে চিহ্নিত করছেন তখন বিবেকানন্দ বললেন, না — জাতি-ব্যবস্থা হল একটি সামাজিক বন্দোবস্ত! পুরোহিতগণ এই ব্যবস্থাকে ধর্মীয় বলে প্রচার করে থাকেন। এই সত্যদৃষ্টি-ই, এই সত্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি-ই হল বিবেকানন্দের অভিনবত্ব।

বিবেকানন্দ যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই যুগ হল পরাধীনতার যুগ। সে-যুগের পুরোধা পুরুষেরা বিদেশি সংস্কৃতির থেকে নিজ সংস্কৃতিকে অনেক বেশি উচ্চমানের বলে মনে করতেন। বিদেশিরা কী বলছেন —

এ ব্যাপারে তাঁরা সচেতন ছিলেন। একদলের বিশেষ চেষ্টা ছিল বিদেশিদের সবকিছুই ভালো — এমনটি প্রতিষ্ঠা করা। আবার অপরপক্ষে আরেক দল মনে করতেন, বিদেশি সংস্কৃতিমাত্রই খারাপ। আমাদের সব কিছু ভালো। বিদেশে গেলে, কালাপাণি পার হলে, জাতিচ্যুত হতে হত। — স্বামী বিবেকানন্দ এই দুই দলের থেকেই ছিলেন ভিন্ন, পৃথক। তিনি বিদেশি সংস্কৃতির সবকিছুই ঠিক বা সবকিছুই বেঠিক—এটি মানতেন না। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, পৃথিবীতে এমন কোনো সংস্কৃতি নেই, যাকে কেবলমাত্র ভালো বা কেবলমাত্র মন্দ বলা যায়। প্রতিটি দেশের কাছে, প্রতিটি সমাজের কাছে আমাদের কিছু শেখার আছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু দেবারও আছে। এ-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য' গ্রন্থে সুন্দরভাবে দুটি সংস্কৃতির তুলনামূলক একটি আলোচনা তুলে ধরেছিলেন। যে-আলোচনাতে বুঝতে পারা যায়, প্রতিটি সংস্কৃতির মধ্যেই ভালো ও মন্দ — উভয় দিকই আছে। কেবল একজনকে মন্দ বলে দূরে সরিয়ে দেওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তা সত্যদৃষ্টিই নয়। তুলনামূলক সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ অভিনব ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতেন, 'ও আমার মাথার মণি' — এ-শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা নয়, এ-যেন সমগ্র বিশ্বের কথা। তিনি যে-দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন সে-দিকেই ইতিবাচক দৃষ্টির মাধ্যমে নিরীক্ষণ করেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'বলো, 'অস্তি অস্তি! নেই নেই করলে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়!' স্বামীজির এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জগৎকে নতুনভাবে বাঁচার পথ দেখিয়েছিল। নতুনভাবে এই ইতিবাচক তত্ত্ব প্রদান করা স্বামী বিবেকানন্দের অভিনবত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেমন মৌলিক, তাঁর ভাবপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের জীবনও মৌলিক। এই মৌলিক জীবনে অভিনবত্বকে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করার জন্য যে-সময়ের প্রয়োজন তা আমাদের হাতে নেই! আমরা শুধু বলতে পারি তিনি ছিলেন নতুন মানুষ, তাঁর সবকিছুই ছিল অভিনব।

গৈরিক সৈনিক

প্রতিমা মুখোপাধ্যায় (১৯৭৭)

স্বামী বিবেকানন্দের কথা ভাবলে আমার মনের মধ্যে ধ্যানমগ্ন কোনো সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষির ছবি ভেসে ওঠে না — তার বদলে দেখতে পাই পরিব্রাজক এক তরুণ সন্ন্যাসীকে — হাতে দীর্ঘ লাঠি, উজ্জ্বল করুণাময় চোখ সুদূরে নিবদ্ধ। সেই চোখে একই সঙ্গে দেখতে পাই দেশের লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের জন্য বেদনা, আর স্বামীজির কল্পনার ভবিষ্যৎ ভারত যেখানে ব্রাহ্মণ অনায়াসে হাত ধরতে পারে চণ্ডালের, যে ভারতে সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে হাত মেলায় স্বচ্ছ আধুনিক মন, যে ভারতে মেয়েরা পায় মানুষের সম্মান।

নরেন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মেছিলেন, তখন পরাধীন ভারতবর্ষের বড়োই দুর্দশা। একদিকে ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার, শোষণ, ভারতীয় সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞা — অন্যদিকে বিদেশি শাসকদের প্রসাদলোভী একদল দেশীয় রাজা-মহারাজা যারা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদের সাহায্য করে। সমাজে ধর্মের নামে নানা ভণ্ডামী, অসহায় নিম্নবর্গের মানুষের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, অন্ধ কুসংস্কার, অসার তন্ত্রমন্ত্রের উপর অশিক্ষিত মানুষের বিশ্বাস — এই সবকিছুই ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা প্রভৃতি থেকে অনেক পিছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছু সুফলও পাচ্ছিল সে যুগের ভারতীয় সমাজ। কিছু সহৃদয় মিশনারি ও শিক্ষাবিদের প্রভাবে তৈরি হয়েছিল নবীন যুক্তিবাদী প্রজন্মের যাঁরা সবরকমের কুসংস্কার এবং অন্যায় সামাজিক নিয়মনীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজের অন্ধকার দিকগুলোর সমালোচনা এবং অস্বীকার করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকেই আধুনিকতা এবং উন্নতির সঠিক পথ বলে মনে করতে লাগলেন।

বিবেকানন্দ ছিলেন এই দুই ধারার বাইরে। ছোটো থেকে জাতপাত, ছুঁৎমার্গ, ভূতপ্রেত ও সমস্তরকম কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। কোনো কিছু যাচাই না করে মেনে নিতে তাঁর ছিল তীব্র আপত্তি। ছেলেবেলার ব্রহ্মদৈত্যের অস্তিত্বই হোক বা পরবর্তীকালে তাঁর গুরু সত্যিই ধাতব মুদ্রা স্পর্শ করতে পারেন কিনা — কোনো কিছুই তিনি নির্বিচারে বিশ্বাস করেননি। স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে বড়ো অবদান হল নতুন এক ভাবধারার সৃষ্টি। নিজে সন্ন্যাসী হলেও সবকিছু ছেড়ে শুধু ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হওয়াকে তিনি জীবনের লক্ষ্য ভাবেননি। পরিব্রাজকরূপে তিনি যখন ভারত পরিক্রমা করছিলেন, সমানভাবে আতিথ্য নিয়েছেন হত দরিদ্রের ঝুপড়ি থেকে বিত্তবানের প্রাসাদে, তখনই মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন মানুষের দুঃখ, প্রত্যক্ষ করেছিলেন মনুষ্যত্বের অপমান; উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের কোটি কোটি মানুষের সবার আগে চাই দু-বেলা দু-মুঠো খাদ্য এবং শিক্ষা; খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, অসহায় মানুষের কাছে ধর্ম একটা বিরাট তামাশা ছাড়া কিছু নয়। তিনি চেয়েছিলেন যুবসমাজ শুধু আধ্যাত্মিক শক্তিতে নয় দৈহিক শক্তিতেও বলীয়ান হয়ে উঠুক। স্বামীজির কথায় 'ঐ যে মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে ঢোক গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও পচা দুর্গন্ধ।' দেশের যুব সমাজকে বলেছিলেন মন্দিরে নয়, খেলার মাঠে যেতে। তাঁর মতে ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে মাংসাহার অত্যাবশ্যক কারণ তারা নিছক নিরামিষ ভোজনের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ছে। শিষ্যদের বলতে শুনি, 'তোরা খুব করে মাংস খাবি, পাপ যদি হয় সে আমার হবে।' একজন সন্ন্যাসীর মুখে এই চরম আধুনিক এবং বাস্তব কথাগুলো সত্যিই আশ্চর্য লাগে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'

— এ লিখছেন, 'লাখো লোক ওঁ কার জপে মচ্ছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বল্‌ছে এবং পাচ্ছে ঘোড়ার ডিম। ... যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে ধার্মিক, তার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ।' স্বামীজি ভারতবাসীকে নতুন করে মনে করিয়ে দিলেন গীতার নিরাসক্ত কর্মের কথা। কেবলমাত্র কর্মেই আমাদের অধিকার যে কর্মের দ্বারা দেশের মানুষের এতটুকু উন্নতি হয় সেই কর্মই প্রত্যেকের ধর্ম হওয়া উচিত। বললেন 'স্বধর্ম'-এর কথা। সকলকেই যে সন্ন্যাসী হতে হবে, সারাক্ষণ ভগবৎ চিন্তা করতে হবে তা নয় — যে গৃহস্থ তার ধর্ম সংসার প্রতিপালন করা আর তাতে যদি কোনো বাধা আসে বীরবিক্রমে সেই বাধা অতিক্রম করা। যে দুটো মানুষের মুখে অন্ন জোগাতে পারে না, বড়ো কাজ সে করবে কী করে? কিন্তু তার সঙ্গেই স্বামীজি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, 'It is the power of concentration and attachment as well as the power of detachment that we must develop.' তিনি বিশ্বকে শোনালেন, 'অয়ম্ ব্রহ্ম'-এর বাণী; জানালেন প্রতিটি মানুষ অমৃতের অধিকারী, ঈশ্বরত্বে সবার জন্মগত অধিকার। তাঁর কথায়, 'দুর্বলতাই একমাত্র পাপ। তিনিই সন্ত, যিনি কখনও দুর্বল হন না। জগতকে একটি কথাই আমার বলার আছে, শক্তিমান হও।' স্বামীজি চেয়েছিলেন আত্মশক্তিতে স্থির বিশ্বাসী যুবসমাজের জীবনের মূলমন্ত্র হোক জীবসেবা। দূর থেকে দয়া বা করুণার ভাবে সেবা নয় — দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করাই হোক তাদের একমাত্র পুজো। জগৎকে শোনালেন নতুন যুগের দর্শন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার / ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর / জীবে প্রেম করে যেইজন / সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামীজি চেয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা যেন প্রকৃত শিক্ষা পায় যাতে তারা স্বাধীনভাবে নিজেরাই কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করতে পারে। সে-যুগের সমাজ মেয়েদের জন্য একটি মাত্র পথই নির্বাচন করেছিল — পিতা বা স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী সংসারধর্ম পালন করা। শিক্ষা পেলে মেয়েরা বিপথে চলে যাবে এ-ছিল সে-যুগের বিশ্বাস। স্বামীজি চেয়েছিলেন উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়ার পর মেয়েরা হবে স্বাধীন, সাহসী, মর্যাদাময়ী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আর তাদের মন হবে উন্নত, ধৈর্যশীল, কোমল ও আত্মত্যাগে উন্মুখ। সে স্বেচ্ছায় নির্বাচন করতে পারবে সংসার জীবন অথবা ব্রহ্মচর্যজীবন। তিনি কখনোই পুরুষ হয়ে মেয়েদের সমস্যার সমাধান করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন কর্মে ও চিন্তায় সম্পূর্ণ স্বাধীন নারী তার নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ করবে।

স্বামীজি চেয়েছিলেন দারিদ্র, বর্ণবৈষম্য, অশিক্ষা, নারীজাতির প্রতি অবহেলা থেকে দেশের মুক্তি। চেয়েছিলেন মানব সভ্যতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন। পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আমরা নেব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এমনকী নিতে হবে শিল্পে বিনিয়োগের মূলধন, জনকল্যাণের জন্য অর্থ; আর তার বিনিময়ে ভারত দেবে আত্মজ্ঞান, অধ্যাত্মবিদ্যা, উন্নততর জীবনে উত্তরণের মন্ত্র। শুধু চাওয়া নয়, — জাপান থেকে শিকাগো যাওয়ার পথে বিখ্যাত শিল্পপতি জে. এন. টাটার দেশে স্টিল কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা শুনে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং কারখানার সঙ্গে সঙ্গে ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত উন্নততর প্রযুক্তির প্রসারকল্পে একটি গবেষণাগার তৈরি করতে উৎসাহ দেন — যাতে ভারত ঐ শিল্পে স্বনির্ভর হতে পারে। শুধু উপদেশই নয়, তিনি নিজে তাঁর পরম অনুরাগী মাইসোরের মহারাজকে অনুরোধ করে গবেষণাকেন্দ্রের জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেন। সেই জমিতেই গড়ে উঠেছে আজকের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অথচ কী প্রবল বাস্তববোধ!

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয় শিষ্যকে 'নির্বিকল্প সমাধি' দেননি, চেয়েছিলেন নরেন হবে বটগাছের মতো — সকলকে ছায়া দেবে, আশ্রয় দেবে। তাই সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দের প্রাণ কাঁদত তাঁর দুর্ভাগা জন্মভূমির জন্য, বিচলিত হতেন ভারতের হতাশ কর্মহীন, উদ্যমহীন, কুশিক্ষা-অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের জন্য। নরেন্দ্রনাথের পরমবন্ধু গিরিশচন্দ্র ঘোষের উক্তিতে যেন আমারই উপলব্ধির প্রতিচ্ছবি, — 'স্বামীজিকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি।'

গুরু ও শিষ্য

অনিতা গুপ্ত (১৯৫৩)

সদ্য গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একটি পারিবারিক মামলায় সাক্ষ্য দিতে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিপক্ষ দলের আইনজীবী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কোনো সাধুর 'চেলা' কিনা। স্বামীজি সদর্পে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি কোনো ভিক্ষাজীবী সাধুর চেলা নন।

কথাটা দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের পূজারি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে। তিনি ছিলেন এক গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সাধক। যাঁর সম্পর্কে ১৮৮৩ সালে কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন — দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন। এক্ষণে পৃথিবীর মাঝে এত বড়ো লোক কেহ নাই। তিনি সুন্দর, সৎ ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি। 'মিরর' পত্রিকায় ২৮ মার্চ, ১৮৭৫ সালে বলা হয়েছিল — আমরা মুগ্ধ হয়েছি তাঁর গভীরতায়, তাঁর উপস্থাপনায়, উপমা রূপকের ব্যবহারে অনর্গল কথা বলে যাওয়ায় — তাঁর আত্মিক শক্তিতে সেগুলি অতি সুন্দর। এ-সবের উৎস হল হিন্দু ধর্মের সত্য ও সৌন্দর্য। কবি কীটস্ এরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন — Truth is Beauty, Beauty is Truth.

১৮৭৬ সালে টাউন হলের সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছিল — তাঁর মধ্যে আছে ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সুমহান উপলব্ধিসমূহ — যা সুদীর্ঘকাল গভীর অভিনিবেশের মধ্যে অনুশীলনের ফল।

১৯৩৬ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন —

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
খেয়ালে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবনা সম্পূর্ণ স্বকীয়, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ, কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ বা বিশেষ কোনো ধর্মগুরুর দ্বারা প্রভাবিত নয়। এর ভিতরে ছিল কবিসুলভ এক অন্তর্দৃষ্টি, সৌন্দর্যমুগ্ধতা। কৈশোরে শরতের আকাশে সাদা মেঘের পাশে শ্বেত বলাকার দৃশ্য দেখে তাঁর প্রথম ভাবসমাধি হয়। গ্রামের তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষদের সঙ্গে মিশে শিখেছিলেন সহজ সত্য কথা বলার ভাষা। তাঁর ভাষা উপমা রূপকের সঙ্গে মিশেছিল পারিবারিক ধর্মনিষ্ঠা। তাঁর ধর্মবোধের সঙ্গে মিশেছে শাক্তধর্মের মাতৃসাধনা, বৈষ্ণবধর্মের প্রেমভক্তি, গীতার নিষ্কাম কর্ম, রামায়ণের ভক্তিবিশ্বাস, মহাভারতের মহাজ্ঞান, বেদ-বেদান্তের বিশ্বচেতনা, লোকধর্মের সহজিয়া ধারা, কবীরের উদারতা। সাকার নিরাকারের দ্বন্দ্বের অতি সহজ মীমাংসা করেছিলেন তিনি। কথা জুড়ে উদ্ধৃত করেছিলেন কবীরের বাণী — 'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।' ব্রাহ্ম-সমাজের সব শাখার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের কেশবচন্দ্র সেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর ছিলেন তাঁর কাছে এক মহাসমুদ্রের মতো। যার কূলকিনারা নেই — ‘ আমায় ডুবাইলিরে, আমায় ভাসাইলিরে। অকূল দরিয়ার মাঝে কূল নাহিরে।’ একটি রামপ্রসাদী গান তিনি খুব গাইতেন — ডুব ডুব ডুবরে আমার মন। এরই প্রতিধ্বনি শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে — ‘রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করে।’

এই সাধকপুরুষের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের দেখা হয়েছিল ১৮৮১ সালে। প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথের নিজের বাড়িতে ঠাকুরকে গান শোনাবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। তখনকার নরেন্দ্রনাথ দত্ত গেয়েছিলেন — ‘মন চল নিজ নিকেতনে’। গানটি ব্রাহ্মসমাজের অযোধ্যানাথ পাকড়াশির লেখা, পরবর্তীকালে যিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের মন্ত্র শেখানোর দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর ওপর।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জেনারেল অ্যাসেম্বলিস ইন্সটিটিউট-এ স্নাতক শ্রেণির ছাত্র, দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে পড়ছিলেন। এই সময় এক ইংরেজ অধ্যাপক ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়াতে গিয়ে বলেছিলেন — কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মাঝে মাঝে ভাবসমাধি হত। এইরকম ভাবসমাধি হয় দক্ষিণেশ্বরের পূজারি সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর ভাবসমাধির কারণ হল তাঁর ওপর জার্মান দার্শনিক কান্ট-এর অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনের প্রভাব। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজে বলেছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর মনে হত দৃশ্যমান এই জগৎ এক অপসৃয়মান ছায়ার মতো। তখন আশেপাশের বাড়ির দেওয়াল স্পর্শ করে তিনি বাস্তব জগতে ফিরে আসতেন। এই ভাবসমাধির ক্ষমতালাভের জন্য তীব্র আকুতি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের মনে। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর কাছে এই ভাবসমাধি লাভের জন্য আবেদন জানিয়ে এসেছেন। অবশেষে একদিন এই ক্ষমতার অধিকারী হলেন তিনি। ‘Master as I saw Him.’ গ্রন্থে সিস্টার নিবেদিতা লিখেছেন — দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী তলে গভীর রাত্রে তাঁরা দুজনে সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতেন — কখনো পাশাপাশি, কখনো মুখোমুখি।

১৮৮৭ সালে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত হলেন দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারিকায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। কন্যাকুমারিকার অদূরে ভারত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত এক নির্জন শিলাখণ্ডে তিনি তিন দিন, তিন রাত ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা ধরা আছে তাঁর রচিত একটি গানে —

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি।
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম বিশ্বচরাচর।

স্বামী বিবেকানন্দ রচিত ‘Kali the Mother’ — এইরকম এক ধ্যানলব্ধ সম্পদ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাটি অনুবাদ করেছিলেন ‘মৃত্যুরূপা মা’ নামে। এই কবিতার পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যায় ১৮৯৮ সালে বান্ধবী নেল হ্যামন্ডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠিতে। অসামান্য পত্রলেখিকা নিবেদিতা গ্রন্থের ৩য় সংখ্যক চিঠি এটি — প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা কর্তৃক অনূদিত এই গ্রন্থ।

১৮৯৮-এর মার্চ মাসে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাসহ তাঁর বিদেশিনী শিষ্যা এহং গুরুভ্রাতাদের নিয়ে অমরনাথে গিয়েছিলেন। তখন ওখানকার ভূপ্রকৃতির দৃশ্য অতি মনোরম। স্বামীজির মনও স্বভাবতই প্রফুল্ল থাকার

কথা। কিন্তু একদিন হঠাৎ কারুকে কিছু না বলে তিনি ক্ষীরভবানী তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ফিরে এসেছিলেন আটদিন পরে। নিবেদিতা লিখেছেন, তাঁর মুখমণ্ডল তখন দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁর মুখের সেই ভাব দেখে নিবেদিতার মনে হয়েছিল নিশ্চয় স্বামীজির কোনো অপার্থিব অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। অমরনাথের পর্ব পর্যন্ত স্বামীজি শিবভাবে ভাবিত ছিলেন। নিবেদিতাকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন অমরনাথের চরণে। কিন্তু ক্ষীরভবানী থেকে ফিরে আসার পর তিনি কেবল মায়ের কথা বলছিলেন — রামপ্রসাদের মাতৃসংগীত গাইছিলেন। ইচ্ছা করছিলেন মায়ের কোলে ফিরে যাবার। প্রশ্ন হল কে এই মা? ক্ষীরভবানীতে তিনি এক মুসলমান মাঝির কন্যাকে কুমারী পূজা করেছিলেন — কাশ্মীরের বাসন্তিক প্রকৃতির মধ্যে কোথাও দুর্যোগের চিহ্নমাত্র ছিল না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'মৃত্যুরূপা মা' কবিতায় পাই ভয়াল দুর্যোগ ও মৃত্যুসম ভয়ংকর বিপর্যয়ের আভাস। কবিতাটি শুরু হয়েছিল এক ভয়ংকর অন্ধকার রাত্রির বর্ণনা দিয়ে। নক্ষত্রহীন ঘন মেঘাবৃত আকাশ, নিকষ কালো অন্ধকার তবু সেই অন্ধকারে ছিল সংগীতের মূর্চ্ছনা — সংগীত স্পন্দিত আঁধার — সেই সঙ্গে মিলেছে ঝড়—যেন লক্ষ লক্ষ উন্মাদের আর্তনাদ, অথবা কারাগার থেকে মুক্ত বন্দীদের চিৎকার। ঝড় যেন উৎপাটিত করতে চাইছে বৃক্ষগুলিকে সমূলে। যেন ঝেঁটিয়ে দূর করতে চাইছে পথের আবর্জনা, নারী ও মড়ক। সমুদ্রও যোগ দিয়েছে এই ষড়যন্ত্রে। পর্বতপ্রমাণ ঢেউগুলি আকাশ ছুঁতে চাইছে। ছড়িয়ে পড়ছে যত দুঃখরাশি। এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে এক নৃত্যরতা নারী মূর্তির চরণধ্বনি। শিশুর মতো ব্যাকুল হয়ে তাঁকে আহ্বান করছেন — 'এসো মা এসো'।

কবি বলেছেন —

'তুমিই মহা ভয়,
নিঃশ্বাসে তোমার মৃত্যু,
প্রত্যেক স্খলিত পদক্ষেপ যেন
চিরকালের মতো ধ্বংস করতে চাইছে পৃথিবী।
তুমিই মহাকাল।
সর্বভয়বিনাশকারিণী,
তুমিই পারো প্রেমকে দুঃখময় করে তুলতে।

আসলে নিছক সৌন্দর্য মানুষকে নেশাতুর করে তোলে। অমরনাথের আনন্দময় দিনগুলি থেকে আটদিনের স্বেচ্ছায় নির্বাসনের মধ্যে স্বামীজি জীবনের কঠিন সত্যকে জানতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কঠিনেরে চিনিলাম, যে কখনো করে না বঞ্চনা।' রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও রয়েছে দুর্দিনের ভয়াল রূপ — 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে ... সব যে হয়ে গেল কালো, নিভে গেল দিনের আলো।' দুঃখের এই অভিজ্ঞতার পরই রয়েছে চরম প্রাপ্তি — 'সকালবেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি।' স্বামীজিরও পরম প্রাপ্তি ঘটেছিল আটদিনের নির্বাসনের মধ্যে।

কিন্তু দুঃখ-মৃত্যু জীবনের যত বড়ো সত্য হোক মানুষ তা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। মন এমন কিছুকে খোঁজে যা শাশ্বত। সুখ-দুঃখের অতীত আনন্দ যা মনকে শান্তি দেয়। 'তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' দুঃখের হলাহল মন্থন করে পাওয়া অমৃত। শেষ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ সেই অমৃতের সন্ধান করেছেন। প্রব্রাজিকা

মুক্তিপ্রাণা রচিত 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থের 'প্রেরণা' অধ্যায়ে 'শান্তি' নামে এমনই একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯০০ সালে নিবেদিতা তখন আমেরিকায়। স্বামীজির কাছে তিনি আদর্শ ব্রতচারিণী হবার জন্য কিছু নির্দেশ প্রার্থনা করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে স্বামীজি তাঁকে 'শান্তি' নামে কবিতাটি উপহার দেন। এই কবিতায় অন্ধকার নয়, বলা হয়েছে আলোর কথা। 'যে আলোক আঁধারের মাঝে ছায়াসম উজ্জ্বল' 'যে আনন্দ চির ভাষাহীন' যে অমৃত এখনো আস্বাদিত হয়নি, দুঃখ ও আনন্দের মাঝখানে যা মিলনের সেতু — সে হল আনন্দ। 'অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলো, সেইতো আমার আলো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বর্তেছিল সিস্টার নিবেদিতার মধ্যে। ১৯০০ সালে নিবেদিতার জন্য লেখা একটি আশীর্বাদবাণীর মধ্যে সেই উত্তরাধিকার বর্তেছে —

মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা
মলয়সমীরে যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,
যে পবিত্র কান্তি বীর্য, আর্য বেদিতলে
নিত্য রাজে বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে,
— এ সব তোমার হোক আরও হোক শত
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।

গুরু-শিষ্যের এই পরম্পরায় গড়ে উঠেছে একটি সুমহান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সেই বটবৃক্ষের ছায়ায় এসে আজও মানুষ খুঁজে পায় সেই শাশ্বত শান্তিকে, লাভ করে এক অপার্থিব অনুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ -সিস্টার নিবেদিতা, গুরু-শিষ্য পরম্পরা একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত।

প্রেমবারি সে যে এনেছে

অপর্ণা মুখোপাধ্যায় (১৯৬১)

বর্তমানে, স্বামীজির সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনকালে আমরা ভারতবর্ষের নারীসমাজ এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। প্রতিনিয়ত সংবাদের শিরোনামে উঠে আসছে ভারতের গ্রামেগঞ্জে, শহরে নারীর প্রতি অমানবিক অত্যাচারের অসংখ্য খবর। নবতম পরিসংখ্যানে প্রতি কুড়ি মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। এছাড়াও আছে কন্যাভ্রূণ হত্যা, পারিবারিক হিংসা। এই সংকটকালে আমার মনে পড়ছে স্বামীজির দূরদৃষ্টির কথা। এই দুঃসময়ের বহু পূর্বেই স্বামীজি ভারতবর্ষের যুবসমাজকে নারীজাতির সম্মান সম্বন্ধে সচেতন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বলেছিলেন মেয়েদের অবহেলা করে তাদের শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। বলেছিলেন নারীজাতি মাতৃস্বরূপা, আমাদের সমাজের অর্ধাঙ্গ। সেই অর্ধাঙ্গকে অবহেলা করে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। তাঁর সাবধানবাণী আমাদের দেশের পুরুষসমাজকে কিছুটা সচেতন করলেও অনেকটাই যে আজও বাকি তার প্রমাণ বর্তমান ভারতে নারীজাতির চূড়ান্ত অপমান, অসম্মান, তার দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন।

আজ স্বামীজির পথ অনুসরণ করে ভারতীয় নারীকে তার নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নিতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের নারীজাতির সামগ্রিক উন্নতি। মেয়েরা যাতে শিক্ষিত হয়ে, নানা শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্য তিনি মার্গারেট নোবেলকে আহ্বান করেছিলেন ভারতে এবং আমরা পেয়েছিলাম ভগিনী নিবেদিতাকে। তৎকালীন ভারতে নারীনির্যাতন, সামাজিক মাপকাঠিতে নারীর নিচুতে অবস্থান স্বামীজির আবেগপ্রবণ কোমল হৃদয়কে মথিত করেছিল। তাই তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের অন্যতম কাজই ছিল নারীজাতির উন্নতি।

বর্তমানে বাঙালি মেয়েরা আর্থিক দিক থেকে অনেকাংশে স্ব-নির্ভর হয়েছে — এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতীয় নারীসমাজ এখনও নিজের ঐক্যবদ্ধ, স্ব-সংগঠিত ও দৈহিক শক্তিতে শক্তিশালী করে উঠতে পারেনি। পারেনি সমাজের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাকে বদলাতে। স্বামীজি-নির্দিষ্ট পথে তারা শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিশালী বা এমপাওয়ারড হয়ে উঠতে পারলে তবেই তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধানের যোগ্য হয়ে উঠবে। আজ স্বামীজি তাই আরও বেশি প্রাসঙ্গিক আমার কাছে, আমাদের কাছে, সমগ্র নারীজাতির কাছে।

অপরাজিতা দাশগুপ্ত (১৯৬৯)

জীবনের অলিগলি দিয়ে চলতে চলতে বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন মন আলোর দিশা খোঁজে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবেকানন্দই সেই ব্যক্তি যিনি অন্ধ মানুষের পথে জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হলেন।

মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণির সমস্যা নয়, অন্ধ হিংসায় মত্ত জনজীবনের কুটিরদ্বারে পৌঁছে বলেছিলেন — ‘দরিদ্রের

কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছু করে নাই।' তাঁর গুরু তাঁকে জগতের দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করতে শেখান। হিংসায় মত্ত ও আর্ত নির্যাতিত মানুষের দেহ, মনের যন্ত্রণা থেকে মানুষকে উদ্ধারের জন্যই বিবেকানন্দ ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। গুরুর আদর্শকে ঘরে-বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্যই সমুদ্রপাড়ি দিয়েছিলেন। বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতি, বহু লোকাচার নিয়ে মানুষ জাতির স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধাশীল হয়েই তিনি সমন্বয়বাদের প্রতি মন অর্পণ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের অনুকরণে নয়, অনুসরণে প্রাচ্যের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

স্বামীজি বিশ্বের সকল শিক্ষাকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন — 'নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ।' কিন্তু স্বামীজি ভারতের ঐতিহ্যকে কারোর হাতে সঁপে দিতে বলেননি। তাই বারবার তিনি সাবধান করে বলেছেন — 'ভয় হয় পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়।' তিনি চেয়েছিলেন মানুষ। বীর্যবান, অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক। আবার তেজস্বিনী মৈত্রেয়ী, গার্গীর মতো বীরাঙ্গনাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের পটভূমিকাতে রয়েছে ধর্মীয় দর্শন, যেখানে গড়ে উঠবে শোষণহীন সমাজ।

প্রখর মেধা, সংগীতের প্রতি অনুরাগ, খেলাধূলায় উৎসাহ, সত্যের অনুসন্ধান করা, ধ্যানের প্রতি অনুরাগ সর্বগুণ নিয়ে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিশুকাল থেকেই জীবনের ছোটোবড়ো ঘটনাকে যাচাই করে নেওয়া, বা সকলের মধ্যে রাজা হওয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। আক্ষরিক অর্থে তিনি ছিলেন প্রকৃত বীর, প্রকৃত বিপ্লবী। পরাধীন ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীর জন্য তিনি অবিরত চিন্তা করতেন। 'ভারত মা' ছিল তাঁর জপের মন্ত্র। তিনি চেয়েছিলেন নবজাগরণ ঘটাতে। তাই ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেননি। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ছুটে গেছেন প্রতিটি মানুষের আঙিনাকে ছুঁয়ে। অদ্বৈত বেদান্ত মতকে স্থাপনের উদ্দেশ্যে শুধু মঠ মিশন স্থাপন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। গুরু-দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন সেইসব ত্যাগী ভ্রাতা ও ভগিনীদের। স্বামী বিবেকানন্দ জগৎবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন —

'যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ।
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।'

ঝরণা ভট্টাচার্য (১৯৬৯)

যে মানুষটার সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী পালন করার জন্য সারা দেশ জুড়ে বড়ো আনন্দের ধুম লেগেছে, আমার ছোটোবেলায় তাঁকে আমি 'বিজুকান্ত' বলে চিনতাম। অনেক পরে তাঁর একটা মস্ত বড়ো ছবি দেখেছিলাম, আমার স্কুলের সবুজ রংয়ের ঠাকুরদালানে মায়ের সিংহাসনের পাশটিতে — দেখলেই মনে হত, ঝকঝকে পেতলের পিলসুজের ওপর অনির্বাণ জ্বলে থাকা এক নিষ্কম্প প্রদীপের আলো। ছোটোবেলায় ঐখানেই দাঁড়িয়ে গাইতাম 'মূর্ত্তমহেশ্বরমুজ্জ্বলভাস্করমিষ্টমমরনরবন্দ্যম্' ...

অনেকদিন পরের কথা — সপরিবার গেছি কন্যাকুমারিকার সাগরতট থেকে বিবেকানন্দ রক দর্শনে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি পেরিয়ে পা রাখলাম সেই এক চিলতে দ্বীপটুকুতে — সর্বক্ষণই তার চারপাশে আছড়ে পড়ছে বিক্ষুব্ধ জলরাশি। তার ওপর হাতে ধরা আছে সমুদ্রের চেয়েও চঞ্চল, আমার ছোট্ট পুত্রের চঞ্চলতর ছোট্ট হাতখানি। তবুও সমস্ত চেতনায় আছড়ে পড়ল এক গভীর অভাবনীয় অনুভূতি। এই মন্দিরের থামগুলো তো আমার সাতজন্মের চেনা। যার নিচেটা চৌকো, তারপর আটকোনা, তারপর গোল নক্সা করা—এই তো আমার স্কুলের চির পরিচিত সেই থাম যার পাশে দাঁড়িয়ে রোজ সকালে আমরা বলতাম 'ওঁ সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু ...', এই সেই থাম যার গায়ে লুকিয়ে আমরা টিফিনবেলায় লুকোচুরি খেলতাম, এই সেই থাম, যাকে জড়িয়ে ধরে স্কুল থেকে বিদায়বেলায় অজস্র কান্নার স্বাক্ষর রেখে এসেছিলাম। সেই থামের পাশে দাঁড়ানো বিবেকানন্দের মূর্তিটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পাড়ার চিরচেনা মানুষটিকে অন্য পাড়ায় অন্যভাবে আবিষ্কার করলাম।

দ্বিতীয় ছবি : স্থান - ত্রিবান্দ্রাম - ওয়ার্কালাসী বীচ। আমরা ভ্রমণার্থী। তখন শীতের দুপুরে সী-বীচে নিজেদের মনে সময় কাটাচ্ছে নিকটবর্তী কলেজপালানো প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষে পড়া কিছু তরুণ-তরুণী। সামান্য বাক্যালাপেই তারা বুঝল আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। হঠাৎ তারা বলল 'Are you from Calcutta? - The city of Swami Vivekananda?' — বলেই আমাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে এগিয়ে এল। যেন আমরাই কত না প্রণম্য। ওদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ দেখে চোখে জল এসে গেল — মনে হল একই শহর কেন, প্রায় একই পাড়ায় থেকেও আমাদের বুকের এককণা আবেগও কি জমা হয়ে আছে?

আর আজ — বাড়ির সামনে বাগানে বিবেকানন্দের ছবি সাজানো রাজনীতির রঙ লাগা মঞ্চে হয়ে গেল শিশুনৃত্য প্রতিযোগিতা এবং পক্ষী প্রদর্শনী। ঠিক বোঝা গেল না আধার এবং আধেয়-র মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটা কী? অথচ যে মানুষটা বারবার বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মেয়েরাও সমাজ নামক পাখিটার অন্যতম ডানা, তাঁর জন্মের সার্ধশততম বছরকে সাক্ষী রেখে সমাজের কী অশালীন ছবি। আচ্ছা, আমরা কি তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করার যোগ্যতা অর্জন করেছি?

মৌলি ঘোষ (১৯৮১)

ছেলেবেলায় ঠাকুরের আসনে দেবদেবীদের মধ্যে রাখা বুদ্ধদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ আর স্বামীজির ছবি দেখিয়ে মা শিখিয়েছিলেন, — 'প্রতিদিন এঁদের প্রণাম করবে।' সেই বুঝতে না পারা শৈশবেই স্বামীজির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই সময় তাঁর ছেলেবেলার গল্প শুনে মনে হত, নন্দদুলালের মতো তিনিও ছিলেন দুষ্টু, দুরন্ত। তাই দুজনেই ছিলেন আমার খুব প্রিয়। ক্লাস সেভেন-এর ছাত্রী আমরা, — পূজনীয়া মৈত্রীপ্রাণা মাতাজি আমাদের 'পরিব্রাজক বিবেকানন্দ' পড়াতেন, — ধীরে ধীরে ঐ সময়েই স্বামীজির সঙ্গে পরিচয় গভীরতর হয়েছে। মনে একদিন প্রশ্ন জেগেছিল, শিক্ষিত অসাধারণ মেধাবী নরেন্দ্রনাথকেও চাকরির জন্য চেষ্টা করতে হয়েছিল কেন? মাতাজির উত্তরে জেনেছিলাম, তিনি সাধারণ নন, তাঁর জীবন দৈবনির্দিষ্ট। পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজির সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁর মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর অসাধারণ মেধায়, পাণ্ডিত্যে, স্মৃতিশক্তিতে, আশ্চর্য বাগ্মিতায়, সংগীত প্রতিভায় আর রাজকীয় ব্যক্তিত্বে। মাতাজির ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ সহমত হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম, — তিনি

মহামানব। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্বামীজির ভূমিকা পড়ে আমি স্তম্ভিত! বুঝতে পারলাম ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের তিনিই প্রেরণাদাতা। ধীরে ধীরে ভারতের নারী জাগরণ, শিল্প, স্থাপত্য, ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর প্রতিটি বক্তব্যই আমাকে অবাক করেছে। মনে হয়েছে তিনি প্রকৃতই ভারতাত্মা। হঠাৎ একদিন বহুপঠিত 'সখার প্রতি' কবিতাটি পড়ে আমার মনে হল, — তিনি তো অনন্ত প্রেমের আধার — মানবপ্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সেবাধর্মের কী আশ্চর্য ব্যাখ্যাকার কবি স্বামীজি। এখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে শুধুই মনে হয়, — ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। না হলে কর্পদকশূন্য হয়ে বিশ্বজয় করা সম্ভব হত না। আকাশের মতো অসীম আর সাগরের মতো গভীর এই মহামানবের জীবনকে উপলব্ধি করতে আমার মতো সামান্য মানুষের অনন্তকাল কেটে যাবে। শুধু নিজেকে ধন্য মনে করি, কৃতার্থ হই এই ভেবে যে, আমি তাঁরই স্মৃতিধন্য নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

সুব্রতা ঘোষ নিয়োগী (১৯৮৮)

সারদা মায়ের প্রতিষ্ঠিত স্বামীজির বহু আকাঙ্ক্ষিত নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরূপেই জীবনের মধুর শৈশবের দিনগুলির সূচনা হয়েছিল। ঠাকুর -মায়ের আশীর্বাদধন্য সেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন আমাদের কাছে ছিল উপাসনাগৃহ।

নিত্যদিনের আসা-যাওয়ায়, আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠে, গানে আমরা যেন সর্বত্র সর্বদা তাঁদের জীবন্ত সত্তা অনুভব করতাম। আজও তাঁদের আশীর্বাদ ও শুভকামনা ছাড়া আমরা যেন দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ি। বিপদে আপদে দুঃখ শোকে জগজ্জননী মা আমাদের তাঁর স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় দেন। কিন্তু এই বিপদকে দুঃখকে ভয়কে জয় করার সাহস ও শক্তি আমরা পাই মায়ের আদরের সন্তান যুবনায়ক, বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। জীবনের দুর্বল মুহূর্তে তাঁর বজ্রদীপ্ত কণ্ঠের অভয়বাণী আমাদের শিরায় শিরায় এমনভাবে অনুরণিত হয় যে আমরা শত আঘাতেও ভেঙে পড়ি না। জীবনযুদ্ধে জয়ের অমোঘবাণী যেন আমরা তাঁর কণ্ঠ থেকেই শুনতে পাই। স্বামীজির দেখানো পথ ধরেই সাহস অবলম্বন করে আমরা অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে যাই। 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' — এই চিরন্তন, শাশ্বত, সত্য বাণীই যেন আমাদের ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শূদ্রের বেড়াজাল ভেঙে সকলকে ভালোবাসতে শেখায়। নরের মধ্যেই যে নারায়ণের উপস্থিতি এই অনুভূতি বোধহয় আমাদের মনের গহন গভীর অতলস্পর্শী স্থানেও চিরকালের জন্য খোদিত হয়ে গেছে।

দেশের যুবকরাই যে দেশের অমূল্য সম্পদ তা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি নিজেই চির যৌবনের দূত হয়ে দেশের যুব সম্প্রদায়ের জাগরণ চেয়েছিলেন। পরাধীন ভারতবাসীর উন্নাসিক মনোভাব, অলসতা, অকর্মণ্যতা, কাপুরুষতা তাঁর অন্তরকে বেদনায় জর্জরিত করে তুলত। সেই নিষ্প্রাণ, অনগ্রসর, ভীরু জাতির বুকে তিনি সর্বদা সাহস ও শক্তি সঞ্চার করেছেন। মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। প্রাচ্য জাতির নানা কুসংস্কার তাঁর অন্তরকে ব্যথা দিত। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সদগুণগুলির সমন্বয় করে ভারতবাসীর মধ্যে জাগরণ ঘটিয়ে তিনি নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর সৎ সাহস, তাঁর উদাত্ত উদার বাণী যেন আমার জীবনের চলার পথের পাথেয়। জীবনের দুর্বল মুহূর্তে তাঁর নীরব অথচ সদা-জাগ্রত উপস্থিতি যেন জয়যাত্রার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি। বিদ্যালয়ের

গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করে নানা উত্থান-পতনে তাঁকেই গুরুরূপে বরণ করি। জীবন থেমে থাকে না। পথ চলতে চলতে পরবর্তীকালে যখন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারূপে প্রবেশ করি তখন নানা অজানা আশঙ্কায়, ভুলভ্রান্তিতে বুক দুরুদুরু করেছে। কিন্তু মনে মনে স্বামীজির সেই উন্নত, বলিষ্ঠ, তেজস্বী মূর্তিখানি চিন্তা করে ও তাঁর বাণী স্মরণ করে সব ভয়, জড়তা, অজ্ঞতা যেন কোথায় দূর হয়ে গেছে। জীবন সদর্থক হয়েছে। মনে হয়েছে সামনের পথ যতই বন্ধুর হোক, যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন স্বামীজির আশীর্বাদকে কাণ্ডারী করেই আমরা সেই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হব। কোথা থেকে যেন সেই বাধাকে দূর করার মন্ত্রশক্তি আমরা শরীর ও মনে লাভ করি। এমনকী মৃত্যুভয়ও তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দের নশ্বর দেহাবসানের দেড়শো বছর পরও তিনি আমার মতো সকলের কাছে চিরযুবক, চির যৌবনের দূত। আমরা আমাদের নিত্যদিনের চলনে-বলনে, কথায়-কাজে, সুখে-দুঃখে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি অনুভব করি এবং করব।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরাণ্‌নিবোধত।

দেবদত্তা চট্টোপাধ্যায় (২০১১)

বিশ্বনিয়ন্তার সর্বকালের অন্যতম সেরা সৃষ্টি — নরশ্রেষ্ঠ 'স্বামী বিবেকানন্দ'। স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত অধ্যায় — যাঁকে ধারণ করতে হয়, আত্মস্থ করতে হয়, বহন করতে হয় দেহের প্রতিটি শিরা-ধমনীতে। স্বামী-রঙ্গনাথানন্দের উক্তি 'আমার দেহে তিনটি রক্ত কণিকা ছাড়াও বিবেকানন্দ নামক একটি কণিকা বহিতেছে' — বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে বিবেকানন্দের কী অদ্ভুত ক্ষমতা মানব মস্তিষ্কের grey cell-এ নিজের জায়গা করে নেওয়ার। কথাপ্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে আমার এক শিক্ষিকা আমাকে স্বামীজির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন — 'যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই আদর্শ স্বামীজি।' তাঁকে তখন একটি কথা বলা হয়নি — শুধু বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হলেই হবে না, তাকে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাধন্যও হতে হবে বটে। কিন্তু বর্তমান যুবসমাজের সদস্যদের অধিকাংশ স্বামীজির নাম পর্যন্ত শোনেনি! কিন্তু এমন কিছু কৌতূহলী মানুষও রয়েছেন যাঁদের মনে স্বামীজির প্রতি 'বিশ্ববন্দনা' নিয়ে প্রশ্ন জাগে। তাঁরা স্বামীজির কীর্তিকলাপ নিয়ে সমালোচনা মুখর হন।

বিবেকানন্দ-বিচার যদি সত্য-নির্ণয়ের জন্য হয়, কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থে কলুষিত দৃষ্টি নিয়ে সে বিচার না হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। তাছাড়া স্বামীজি তো স্বয়ং বলেছেন — 'যা বলি সে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের মতো সব কথায় সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি।'

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন 'The Hindu Monk' কিন্তু শুধু এই কি তাঁর পরিচয়? তিনি একাধারে ছিলেন আচার্য, এক অত্যাধুনিক দার্শনিক, এক অসামান্য সোশালিষ্ট, তথা এক দুর্ধর্ষ সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ। স্বামীজি মানবজীবনের যে চিরকালীন তত্ত্ব প্রকাশ করেন তা ছিল শাশ্বত সত্য। মানুষের সমাজজীবন দেশকালের সীমায় বাঁধা হলেও নিছক মানুষ চিরকালের। তাই অনেকদিন আগেকার বলা কথাগুলো আজও উপযোগিতা হারায়নি। ধর্মের প্রতি মানুষের সচরাচর দৃষ্টিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন — 'শাস্ত্র যদি সমস্ত লোককে সকল অবস্থায় সাহায্য না করিতে পারে, তবে সে শাস্ত্রের কী প্রয়োজন?

'... শাস্ত্র যদি কর্মচঞ্চল পৃথিবীতে দৈনিক শ্রম, রোগ, শোক, দারিদ্র্যের মধ্যে, অনুশোচনাময় সুখে, বিজয়ের আনন্দে, পরাজয়ের অন্ধকারে এবং শেষে মৃত্যুর ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষকে আশার আলো জ্বালাইবার উপায় না দেখাইতে পারে, তবে দুর্বল মানুষের কাছে শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই।'

স্বামীজি বস্তুনিরপেক্ষ জ্ঞানের রাজ্যে বাস করেননি। পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতির ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেছেন ও তাকে হৃদয়ের স্পর্শে আত্মসাৎ করেছেন।

একালে বিচারবুদ্ধি ও শ্রেয়োজ্ঞানের অভাবে আমরা ভেবে নিয়েছি, বোধহয় সব পেয়ে গিয়েছি, চেষ্টার আর মননের সাহায্যে লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে জেনে সেদিকে এগোনোর পথ নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে না, যে পথ হারানোর পথ ধরেছি, তা সকল আকুতিকে প্রশান্তি দেবে।

স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের বুকে ঘটে চলা বহু আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল ভারতীয় যুবসমাজ। জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্রের উক্তিটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুবসমাজের উপর স্বামীজির প্রভাব কতখানি ছিল!

'চরিত্র গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করতে পারি না।' স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম আমাদের কারোর অজানা নয়।

আজ ভারতবর্ষের ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্তির ৬৪ বছর পরে ভারত অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকাংশে স্বাবলম্বী, ভারতের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার স্বভাবের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী বিবদমান রাষ্ট্র নয়। কিন্তু ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সংঘর্ষের যে তুমুল ঝড় উঠেছে, তা তো সহজে থামবার নয়! স্বামীজি বলেছিলেন আজ থেকে ১৫০ বছর পরে ভারতবর্ষের যুবসমাজ আমার কথাকে কাজে পরিণত করবার অসম প্রতিভা প্রদর্শন করবে। সাংখ্যতত্ত্বের বিচারে সেই সময়কাল প্রায় উপস্থিত। কিন্তু কোথায় সেই দুঃসাহসিক জীবনীশক্তি? কোথায় স্বামীজির সেই অধ্যাত্মের বন্যা যা ভারতবর্ষের বুকে সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে? জড়বাদের আতিশয্য কি অধ্যাত্মবাদের ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দিচ্ছে? এই সাংঘাতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই আমার অন্তর কেঁপে ওঠে — পরমুহূর্তেই মনে হয়, নাহ্-এ কী করে সম্ভব? তা হলে তো স্বামীজিই মিথ্যা হয়ে যাবেন।

স্বামীজি বলেছিলেন 'be and make' কিন্তু বর্তমান সমাজে তো 'be' হয়ে ওঠার আগেই make করতে বলা হয় নয়তো 'be' হতেই দেওয়া হয় না। দেশের স্বাধীনতা তো আমরা বহুদিন আগে প্রাপ্ত হয়েছি কিন্তু মনের স্বাধীনতা — তা কি আছে আমাদের? তবুও আমি আশাবাদী। স্বামী গম্ভীরানন্দের এই কথাটি বারংবার মনে পড়ে — 'ভগবৎ পথসঞ্চারী ইতিমূলক সক্রিয় প্রীতি ও শক্তির মূর্তবিগ্রহ যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর হৃদয় দ্বারে নববার্তা লইয়া সমুপস্থিত— কে তাঁহাকে বরণ করিয়া নবযুগে রূপায়ণ ত্বরান্বিত করিবে?' যেদিন এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় যুবসমাজ সোচ্চারে ঘোষণা করবে — 'আমরা করব!' সেদিন ভারতাত্মা সপ্তর্ষির চরণে নিবেদিত হবে।

বিনোদিনী দাসী : দেড়শো বছরের ধুলোয় ঢাকা মুখ

সুদক্ষিণা ঘোষ (১৯৭৬)

১. পুঁটি থেকে বিনোদিনী

আজ থেকে ঠিক দেড়শো বছর আগে, ১৮৬৩ সালে, নগর কলকাতার এক প্রান্তিক পল্লিতে জন্ম হয়েছিল পুঁটি নামে দরিদ্র ঘরের এক মেয়ের। জন্মের সালটুকু তার যদি বা মনে রেখেছিল কেউ কেউ, তার মতো মেয়ের জন্মের তারিখ আবার কে কবে মনে রাখে! ছোটো মেয়েটার নাম তো তখনও পুঁটি-ই, ধাম একটা ছিল অবশ্য, খোলার চালের ঘর হলেও ঠিকানাও তার ছিল একটা ১৪৫ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট; স্বজন বলতে ছিল মা, দিদিমা আর ছোটো একটা ভাই। ঘর ভাড়া দেওয়া ছাড়া আয় তখন আর বিশেষ কিছু ছিল না তাদের গরিবের সংসারে, খুব ছোটোবেলায় অভাব-দুঃখ তত বুঝতে না পারলেও, বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুঁটির মতো ছোটো মেয়েও অনেকটাই অনুভব করতে শুরু করেছিল তার মা-দিদিমার আর্থিক অসহায়তা।

সমস্ত সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর আয়ের একটা চমকপ্রদ উপায় বার করেছিলেন পুঁটির মা-দিদিমা। পুঁটির পাঁচ বছরের ভাইটার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন আড়াই বছরের এক মেয়ের সঙ্গে, আর সেই বিয়েতে যে-কটি অলংকার পেয়েছিলেন, তা-ই একটি একটি করে বিক্রি করেই চেষ্টা করেছিলেন সংসারের চাকাটাকে সচল রাখবার। তবে দীর্ঘজীবী হয়নি পুঁটির এই ভাইটি, বালকপুত্রের অকালপ্রয়াণে বেশ কিছুদিন অর্ধ-উন্মাদের দশায় কেটেছিল পুঁটির স্নেহময়ী মায়ের রাত-দিন।

ওই বালিকাবয়সেই পুঁটিরও একটা বিয়ে দিয়েছিলেন তার দিদিমা, বালক বরটির মুখ আর তত মনে পড়ে না পুঁটির কারণ অল্পদিন পরেই নাকি পুঁটির মাসশাশুড়ি এসে নিয়ে গিয়েছিলেন সে-ছেলেটিকে, আর কখনো আসতে দেননি তাকে। পরে লোকের মুখে পুঁটিরা শুনেছে নতুন বিবাহে তার নতুন সংসার পাতবার খবর; তবু তার চেয়ে বয়সে অল্প বড়ো আর সুন্দর এক বালক বরের স্মৃতি আজীবন মনে রয়ে গেছে পুঁটির, ভাই আর ভ্রাতৃবধূর পাশাপাশি সেই সুন্দর বালকের সঙ্গে একত্রে খেলা করবার অনেকগুলো বিকেলবেলার শৈশবস্মৃতিও কোনোদিন মুছে যায়নি তার মন থেকে।

বাংলাদেশের এমনি সব পুঁটিদের জীবন যেমন চলে, সুখে-দুঃখে দ্বন্দ্বে-ছন্দে হয়তো তেমনি করে চলেই যেত বালিকা এই পুঁটির জীবনও, যদি না গঙ্গা বাইজি নামে এক প্রসিদ্ধ গায়িকা তাদের একতলার পাকা ঘরখানার বাসিন্দা হয়ে আসতেন একদিন। এই গঙ্গাবাই গঙ্গামণি নামে একদিন খ্যাত হয়েছিলেন থিয়েটারের জগতে, ন-বছরের পুঁটি খুব ভালোবাসত তাঁকে, 'গোলাপফুল' সই পাতিয়েছিল তাঁর সঙ্গে, বাল্যসখী সেই গোলাপ-সইয়ের কাছেই পুঁটিকে গান শিখতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার দিদিমা। আর এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল পুঁটির জীবনের মোড় ফেরা।

গানের কারণেই পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর ব্রজনাথ শেঠ নামে সংগীত ও নাট্যানুরাগী দুই ভদ্রলোক আসতেন গঙ্গামণির ঘরে, পুঁটির গুণে সন্তুষ্ট আর পুঁটিদের আর্থিক অবস্থায় সহানুভূতিপরায়ণ হয়ে তারাই একদিন প্রস্তাব করলেন পুঁটিকে থিয়েটারে পাঠানোর, আর সেই প্রস্তাবে পুঁটির দিদিমার সম্মত হওয়ার সিদ্ধান্তটাই একেবারে বদলে দিল পুঁটি নামে সাধারণ এক বালিকার জীবনের অভিমুখ, ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে পা দিতে দিতে মুছে গেল পুঁটি নাম, জেগে উঠতে লাগল দশ-টাকা-মাইনে-পাওয়া এক নতুন মেয়ে, রূপ-রং-আলো-গন্ধে মাখামাখি নতুন এক জগৎ প্রতিদিন খুলে যেতে লাগল তার সামনে, নতুন নামে নতুন জন্ম হল তার — বিনোদিনী।

একা বিনোদিনীই নয়, বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের এই অভিনেত্রীরা সকলেই সমাজের এমন এক স্তর থেকে উঠে এসে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন যে তাঁদের সকলেরই মনে হত, এ তাঁদের এক আশ্চর্য মুক্তির পথ। অমৃতলাল বসু তাঁর 'স্মৃতিকথা'-য় প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন এই অভিনেত্রীদের 'নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষালাভের পিপাসা ও যত্ন এবং কর্মস্থলে শীলতা রক্ষা, সহজ ভাব'-এর, সেই সঙ্গেই লিখেছিলেন,

> স্পষ্টই তারা আমাদের কাছে বলেছে যে, উৎপীড়িতাদের জন্য এই নতুন পথ খুলে আমাদের আশ্রয় দিয়ে যে কত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন, তা বলতে পারি না।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার-এ নিজের বালিকাবেলার সেই হয়ে-ওঠার মুহূর্তগুলির কথাও নিজেই লিখেছিলেন বিনোদিনী, 'আমার কথা' নামে তাঁর আত্মজীবনকথার পাতায় চোখে পড়ে তাঁর এই কথাগুলি,

> এই সময় হইতে আমার নূতন জীবন গঠিত হইতে লাগিল। সেই বালিকা বয়সে, সেই সকল বিলাস বিভূষিত লোকসমাজে সেই নূতন শিক্ষা, নূতন কার্য্য, সকলই আমার নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জানিতাম না, তবে যেরূপ শিক্ষা পাইতাম, প্রাণপণ যত্নে সেইরূপ শিক্ষা করিতাম। সাংসারিক কষ্ট মনে করিয়া আরও আগ্রহ হইত। মাতার শোকদুঃখপূর্ণ মুখখানি মনে করিয়া আরও উৎসাহ বাড়িত।

এই সময়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটাব-এ বড়ো মাপের অভিনেত্রী ছিলেন চারজন — রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী আর নারায়ণী। ওইটুকু মেয়ে সেদিন বিনোদিনী, সবেই শিখতে শুরু করেছে নিজের কাজটুকু, তবু মন তার পড়ে থাকে ওই বড়ো বড়ো অভিনেত্রীদের কাছেই, কেবলই ভাবে, 'আমি কেমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের মত কার্য্য শিখিব!' শেখবার অত আগ্রহ দেখে বড়ো অভিনেত্রীদের কাছে আদরও পায় ছোটো বিনোদিনী, গরিবের মেয়েটির রোজ থিয়েটারে পরে আসবার উপযোগী পোশাক নেই দেখে রাজকুমারী তার জন্য তৈরি করিয়ে দেন হাত-কাটা দুটি ছিটের জামা, আনন্দের আর সীমা থাকে না ছোটো মেয়েটির। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেই মহেন্দ্রলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, বেলবাবু (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) প্রমুখের কাছে অভিনয়শিক্ষার পাঠ নিতে শুরু করে দেয় বিনোদিনী।

বিনোদিনীর জীবনের প্রথম মঞ্চাবতরণ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার-এর 'শত্রু-সংহার' নাটকে, ১৮৭৪ সালের ১২ ডিসেম্বর, বিনোদিনীর বয়স তখন এগারো; ছোটো মেয়ের ছোট্ট ভূমিকা, দ্রৌপদীর সখী। দর্শকের করতালির তাৎপর্য তখনও বুঝতে শেখেনি বিনোদিনী, কিন্তু প্রথম মঞ্চাভিনয়েই পেয়েছিল দর্শকের বিপুল করতালির অভ্যর্থনা। বিনোদিনী তখনও বালিকাই, কিন্তু প্রতিভার অঙ্কুর চিনতে হয়তো দেরি হয়নি বিনোদিনীর শিক্ষাগুরুদের,

তাই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরবর্তী নাটক 'হেমলতা'-র যুবতী নায়িকা নির্বাচিত হলেন বিনোদিনীই। শিক্ষাগুরুদের হতাশ করেননি বিনোদিনী, মান রেখেছিলেন তাঁদের আস্থার, নায়িকা হেমলতা অভিনয়ে মুগ্ধ করেছিল সকলকেই; বিনোদিনীর এই চরিত্রায়ণ কেবল বিড়ম্বনার কারণ ছিল একজনেরই, সে ওই থিয়েটারের বেশকারী, বিনোদিনীর বালিকা-শরীরটিকে যুবতীর উপযোগী দেখানোর দায় তো কেবল তাঁরই ছিল!

বাংলাদেশের এমনি সব পুঁটিই কেন বিনোদিনী হয়ে উঠতে পারে না, কোন গুণ, কোন উপাদান দিনে দিনে পুঁটিকে গড়ে তুলেছিল বিনোদিনী করে, হয়ে-ওঠার সেই চমৎকার ছবিখানিও ধরা আছে বিনোদিনীর কলমেই; 'হেমলতা' নাটকে অভিনয় প্রসঙ্গেই প্রস্তুতিপর্বের দিনগুলির কথা লিখেছেন বিনোদিনী 'আমার কথা'-য়,

> আমি যখন কার্য্য স্থান হইতে বাড়ীতে আসিতাম, সেই সকল কার্য্য আমার মনে আঁকা থাকিত। তাঁহারা যেমন করিয়া বলিয়া দিতেন, যেমন করিয়া ভাব ভঙ্গি সকল দেখাইয়া দিতেন, সেই সকল যেন আমার খেলার সঙ্গিনীদের ন্যায় চারিদিকে ঘেরিয়ে থাকিত। আমি যখন বাড়ীতে খেলা করিতাম তখনও যেন একটা অব্যক্ত শক্তি দ্বারা সেই দিকেই আচ্ছন্ন থাকিতাম। বাড়ীতে থাকিতে মন সরিত না, কখন আবার গাড়ী আসিবে, কখন আমায় লইয়া যাইবে, তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সদাই মনে হইত।

'হেমলতা'-য় অভিনয়ের পর থেকেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের নায়িকা চরিত্রের প্রধান দাবিদার হয়ে উঠলেন বিনোদিনী, একের পর এক অভিনয় করে চললেন 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে কামিনী, 'লীলাবতী' নাটকে লীলাবতী, 'শরৎ-সরোজিনী'-তে সরোজিনী এবং 'নীলদর্পণ' নাটকে সরলতার ভূমিকায়।

অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার উত্তর ভারত যাত্রা করল, ১৮৭৫ সালে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, মতিলাল সুর, কাদম্বিনী, লক্ষ্মীমণি প্রমুখ অভিজ্ঞ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গী হলেন বছর বারোর বিনোদিনীও। দু-হাত ভরে এই সফর থেকে নানা জাতের নানা স্বাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন বিনোদিনী, ভয়-বিস্ময়-কৌতুক জড়ানো সে-সব অভিজ্ঞতা, সঞ্চয় করলেন নানা মাপের দর্শকের সামনে নানা বিচিত্র পরিস্থিতিতে অভিনয় করবার অভিজ্ঞতাও।

উত্তর ভারত থেকে ফিরে আসবার পর উপেন্দ্রনাথ দাসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী নাটকের আয়োজনে বিখ্যাত হয়ে উঠল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, মঞ্চে ইতিহাস সৃষ্টি করল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের নামভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয়। বিনোদিনীর কলমে ধরা আছে সেই ছবি, কীভাবে এ-নাটকে অভিনয় করতে করতে 'আত্মহারা' হয়ে যেতেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, আর আত্মবিস্মৃত সে-অভিনয় দেখতে দেখতে কেমন বিভোর হতেন প্রেক্ষাগৃহের দর্শকরাও, 'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এ বিনোদিনী লিখেছেন, সরোজিনীকে বলি দেবার জন্যে তখন আনা হয়েছে যূপকাষ্ঠের কাছে, রাজমহিষীর অনুরোধ উপেক্ষা করে স্বদেশের কল্যাণে কন্যার বলির আদেশ দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন রাজা, তখনই

> কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী ভৈরবাচার্য্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বললেন, 'সব মিথ্যে সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর,' অমনই সমস্ত দর্শক এত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁরা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে স্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই ড্রপ ফেলে দেওয়া হল; তাঁদের স্টেজের ওপর থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে সকলে শুশ্রূষা করতে লেগে গেল! তাঁরা যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন আবার অভিনয় আরম্ভ হল।

১৮৭৬ সালের শেষে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে শরৎচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল থিয়েটার-এ এলেন বিনোদিনী। সে-সময়ে বেঙ্গল থিয়েটার-এ ছিলেন সুকুমারী দত্ত (গোলাপসুন্দরী), এলোকেশী ও বনবিহারিণী (ভুনি)-র মতো অভিনেত্রীরা। সময়ের বিচারে অভিনেত্রী জীবনের খুব বেশি দিন হয়তো বেঙ্গল থিয়েটার-এ কাটেনি বিনোদিনীর, কিন্তু তাৎপর্যের বিচারে বেঙ্গল থিয়েটার তাঁকে দিয়েছে অনেক। বেঙ্গল থিয়েটারের শরৎচন্দ্র ঘোষকেও আজীবন নিজের এক নাট্যগুরু বলেই মেনে এসেছেন বিনোদিনী, তাঁর কাছে অভিনয় শিক্ষা করেই বিনোদিনী অভিনয় করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের নানা উপন্যাসের নাট্যরূপে; কখনো 'মৃণালিনী'-তে মনোরমার ভূমিকায়, কখনো 'কপালকুণ্ডলা'-য় কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, কখনো-বা একাধিক রজনী 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকে অভিনয় করেছেন তিলোত্তমা আর আয়েষার দুই বিপ্রতীপ চরিত্রে, এমনকী, এক রাত্রে আশমানি চরিত্রাভিনেত্রীর অনুপস্থিতিতে নবাবপুত্রীর বেশ পালটে দাসীর পোশাক পরে তাঁকেই নামতে হয়েছে আশমানি চরিত্রেও, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর নাট্যরূপেও অভিনয় করেছেন প্রমীলা চরিত্রে।

কিন্তু কেবল কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রাভিনয়ের সুযোগই নয়, বিনোদিনীর অভিনেত্রী-মননই এক নতুন পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছিল বেঙ্গল থিয়েটারের সাংস্কৃতিক পরিবেশের সান্নিধ্যে এসে; কেবল শরৎচন্দ্র ঘোষ-ই ছিলেন না তখন থিয়েটারে, নিয়মিত আসতেন সত্যব্রত সামশ্রমী, উমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ীর মতো মানুষেরাও, মা-দিদিমার আদরে গড়া গরিব পুঁটির অনেকখানি বিনোদিনী হয়ে-ওঠা এই বেঙ্গল থিয়েটারেই।

এই বেঙ্গল থিয়েটার-এই কেদারনাথ চৌধুরী আর গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন এলেন 'কপালকুণ্ডলা'-র অভিনয় দেখতে, বিনোদিনীর অভিনয়ে মুগ্ধ গিরিশচন্দ্র আহ্বান জানালেন তাঁকে ন্যাশনাল থিয়েটার-এ।

শুরু হল বিনোদিনীর অভিনেত্রী-জীবনের তৃতীয় পর্ব। ১৮৭৭-এর শেষে গিরিশচন্দ্রের আমন্ত্রণে বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে এলেন বিনোদিনী। গিরিশচন্দ্রের কাছে অভিনয় শিক্ষা করে দিনে দিনে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল বিনোদিনীর প্রতিভা আর ব্যক্তিত্ব। ন্যাশনাল থিয়েটার-এর 'মেঘনাদ বধ'-এ কেবল প্রমীলা নয়, চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, বারুণী, রতি, মায়া, মহামায়া ও সীতা — একই সঙ্গে এই সাত-সাতটি চরিত্রে অভিনয় করলেন বিনোদিনী, 'পলাশীর যুদ্ধ'-এ অভিনয় করলেন ব্রিটানিয়া-র ভূমিকায়, 'বিষবৃক্ষ'-এ অপাপবিদ্ধা কিশোরী কুন্দনন্দিনী আর 'সধবার একাদশী'-তে চঞ্চলা কাঞ্চনের ভূমিকায় একই পারগতায় মাতিয়ে তুললেন রঙ্গমঞ্চকে।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রিয় শিষ্যা বিনোদিনীর সম্পর্ক আর তাঁর কাছে বিনোদিনীর শিক্ষার্জনের নানা মুহূর্ত ছড়িয়ে আছে বিনোদিনীর আত্মকথন দুটির পাতায় পাতায়; গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গে 'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এ কখনো লিখেছেন বিনোদিনী,

> গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার জোর জবরদস্তি, মান অভিমান রাগ প্রায়ই চলত। তিনি আমায় অত্যধিক আদর দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন। আমিও তাই বড্ড বেড়ে উঠেছিলুম, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করতুম, কিন্তু তার জন্য তিনি আমায় একটি দিনের জন্যও তিরস্কার করেননি, অনাদর অযত্ন ত করেনই নি। তবে আমিও একটি দিনের জন্য এমন কোন কাজ করি নি, যাতে তাঁর এতটুকু ক্ষতি হয়।

কখনো আবার 'আমার কথা'-য় লিখেছেন বিনোদিনী, অবসর সময়ে অন্য কোনো গল্প ভালো লাগত না তাঁর, ভালো লাগত কেবল যখন বিলাতের বড়ো বড়ো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গল্প বলতেন গিরিশচন্দ্র, বিলেতের কোন অভিনেত্রী পাখির আওয়াজের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের স্বর সাধত, ব্যাণ্ডম্যান কেমন হ্যামলেট সাজত, কেমন

ফুলের পোশাক পরত ওফেলিয়া; কিংবা ভালো লাগত, যখন শেকসপিয়র, মিল্টন, বায়রন, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শোনাতেন গিরিশচন্দ্র, কিংবা বলতেন, কোন পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রজনী'-ই বা রচিত কোন ইংরাজি পুস্তকের ভাব সংগ্রহে। এইসব মুহূর্তগুলিই ধরা রয়েছে হয়ে-উঠতে-থাকা বিনোদিনীর কলমে, রয়েছে এই সব কিছু থেকে সংকলিত বিনোদিনীর নিজস্ব অর্জনের মুহূর্তগুলিও, যখন তিনি শুধু শুনতেন না, 'তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা' করতেন। অর্জনের এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে নিজের অভিনয়ক্ষমতার যোগ্যতা বিচার করতেও শিখেছিলেন বিনোদিনী,

> ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়া পাখীর চতুরতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই। কোন বিষয়ে তর্ক বা যুক্তি দ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়-নির্ব্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম।

'মৃণালিনী'-তে মনোরমা চরিত্রে বিনোদিনীর অভিনয় দেখে মনোরমা চরিত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলেছিলেন,

> আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই; আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল!

কিংবা, 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী' শীর্ষক লেখায় লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র,

> 'মৃণালিনী'তে আমি পশুপতি সাজিতাম, বিনোদ মনোরমা সাজিত। অন্যান্য অনেক নাটকেই আমরা নায়ক-নায়িকার অংশগ্রহণ করিয়াছি; ... মনোরমার কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, আমি প্রতি অভিনয়েই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবুবর্ণিত সেই বালিকা ও গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই শিক্ষাদাত্রী তেজস্বিনী সহধর্ম্মিনী আবার পরক্ষণেই 'পশুপতি, তুমি কাঁদছ কেন?' বলিয়াই প্রেমবিহ্বলা বালিকা। হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগ্নী, ভ্রাতর মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই 'পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়া' অসাধারণ অভিনয়-চাতুর্য্যে প্রদর্শিত হইত।

বারকয়েক মালিকানা বদলে ১৮৮১ সালে প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর হাতে পৌঁছল ন্যাশনাল থিয়েটার, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বীরকৃষ্ণ দাঁ-দের পয়সার প্রতাপের ছায়া দীর্ঘগামী হতে লাগল। মুনাফার জোরে শিল্পীর কদর দ্রুত হারিয়ে যেতে লাগল বাংলার মঞ্চ থেকে, কাশীতে একটা মাস ছুটি কাটানোর অপরাধে বিনোদিনীর মতো তারকা অভিনেত্রীরও সারা মাসের মাইনে অনায়াসেই কেটে নিলেন থিয়েটারের মালিক প্রতাপচাঁদ। ক্ষুব্ধ হলেন বিনোদিনী, কাশী থেকে ফিরে তখনও বেশ অসুস্থ তিনি, তবু অপমানে-অভিমানে তক্ষুনি ছেড়ে দিতে চাইলেন ন্যাশনাল থিয়েটার, সাময়িকভাবে তাঁকে নিরস্ত করল গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল বসুর পরামর্শ; কিন্তু একা বিনোদিনী নন, এইরকম পরিবেশে হাঁফিয়ে উঠছিলেন সকলেই, সন্ধান করছিলেন বিকল্প পথ।

বিকল্প পথ এল। এল আর এক ধনী মাড়োয়ারি যুবকের হাত ধরেই, তবে বিকল্প প্রস্তাবের সঙ্গেও জড়িয়ে রইল তার বিনোদিনী-মুগ্ধতার শর্ত। কী হয়েছিল মুগ্ধ যুবকের সেই শর্তের পরিণতি, সে-কথা তো আজও প্রায় মিথ হয়েই জড়িয়ে আছে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিকথায়। সে এক অন্য ইতিহাস। তথ্য কেবল এইটুকু জানায়, ধনী ওই মাড়োয়ারি যুবকের উৎসাহে তার অর্থে গড়ে উঠল এক নতুন থিয়েটার — স্টার থিয়েটার। ১৮৮৩-র ২১ জুলাই নতুন নাটক নিয়ে পথ চলা শুরু হল নতুন এই মঞ্চের, প্রথম দিন মহাসমারোহে অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রের নতুন নটাক 'দক্ষযজ্ঞ', সতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বিনোদিনী, প্রচণ্ড ভিড়ে আসনের অভাবে বহু দর্শককেই ফিরে যেতে হল সেদিন।

এর পরেও স্টারের মঞ্চে খুব কম চরিত্রে অভিনয় করেননি বিনোদিনী, 'নল-দয়মন্তী', 'ধ্রুবচরিত্র', 'শ্রীবৎসচিন্তা', 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'বুদ্ধদেবচরিত'-এর মতো একের পর এক প্রতিটি নাটকেই মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী ছিলেন বিনোদিনী-ই; কখনো 'নল-দময়ন্তী'-তে দময়ন্তী, কখনো 'ধ্রুবচরিত্র'-এ সুরুচি, অথবা 'শ্রীবৎসচিন্তা'-য় চিন্তা, কিংবা 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এ প্রহ্লাদ; এর পাশাপাশি 'বিবাহবিভ্রাট'-এর মতো নাটকে বিলাসিনী কারফরমা-র চরিত্রেও অসাধারণ অভিনয় করে দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিলেন বিনোদিনী। বিনোদিনীর এই অভিনয় নিপুণতা দেখতে দেখতে লিখেছিলেন তাঁর গুরু গিরিশচন্দ্রও,

> গুরুগম্ভীর ভূমিকায় (Serious Part) বিনোদিনীর যেরূপ দক্ষতা, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', প্রহসনে ফতীর ভূমিকায় এবং 'বিবাহ বিভ্রাটে' বিলাসিনী কারফর্ম্মার ভূমিকায়, 'চোরের উপর বাটপাড়ি'তে গিন্নী, 'সধবার একাদশী'তে কাঞ্চন প্রভৃতি হালকা ভূমিকায়ও বিনোদিনীর অভিনয় অতি সুন্দর হইত। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, পঞ্চরং, নক্‌সা প্রভৃতিতে সে সময় বিনোদিনীই নায়িকা ছিল। প্রত্যেক নায়িকাই অন্য নায়িকা হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রশংসনীয় হইত।

মাত্র বারো বছরের অভিনেত্রী জীবন বিনোদিনী দাসীর। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, ন্যাশনাল থিয়েটার আর স্টার থিয়েটার — এই চারটি রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত অভিনয় জীবনে প্রায় ৮০টি নাটকে ৯০টিরও বেশি চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিনোদিনী; আর কত বিচিত্র ধরনের সে-সব চরিত্র তাঁর, একদিকে যেমন রাধিকা, সীতা, প্রমীলা, দ্রৌপদী, কৈকেয়ী, উত্তরা, দময়ন্তী, সত্যভামা বা গোপা, অন্যদিকে তেমনি কাঞ্চন, কামিনী, আয়েষা, তিলোত্তমা, মনোরমা, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, কুন্দনন্দিনী বা বিলাসিনী কারফরমা বারে বারে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়ে।

স্টার থিয়েটারেই গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে ঘটল চৈতন্যদেবের ভূমিকায় বিনোদিনীর অতুলনীয় আবির্ভাব। বাংলার এক বিশিষ্ট যুগ আর যুগপুরুষকেই কেবল মূর্ত করে তোলেনি বিনোদিনীর অসামান্য অভিনয়, এই নাটককে কেন্দ্র করেই রঙ্গমঞ্চের বারাঙ্গনা-দূষিত সীমানায় পুণ্য পদপাত ঘটল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের, তাঁর 'চৈতন্য হোক' আশীর্বাদে মনের এতদিনের যত গ্লানি সব নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে গেল বিনোদিনীর। কী যে এক ঘোরের মধ্যে 'চৈতন্যলীলা' নাটকে নিমাই চরিত্রে অভিনয় করতেন বিনোদিনী, কীভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়তেন কোনো কোনো দিন, সেইসব বিবরণ ধরা আছে বিনোদিনীর কলমেই, 'আমার কথা'-য় বিনোদিনী লিখেছেন,

> ... বাল্যলীলার সময় 'রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী' বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম 'কি দেখ মালিনী?' সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম; আমার মনে হইত 'ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ', উনিই তো বলিতেছেন, আমি সব মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনি করিতেছি! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত, চারিদিক যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত।

স্টার থিয়েটারে বিনোদিনীর শেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চিন্তামণি, 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে। উনিশ শতকের আশির দশক শেষ হয়ে আসছে তখন, বিনোদিনীর বয়স ২৩ পার হতে চলেছে। ১৮৮৭-র প্রথম দিনটিতে 'বেল্লিক বাজার' নাটকে তিনি অভিনয় করলেন রঙ্গিণী চরিত্রে, তার পরেই স্টার-এর শিল্পীরা কুড়ি দিনের জন্য পাড়ি দিলেন মফস্‌সল সফরে, বিনোদিনী সঙ্গী হলেন না তাঁদের; সফর থেকে ফিরে স্টার-এ অভিনয় শুরু হল ২২ জানুয়ারি থেকে, বিনোদিনীকে আর দেখা গেল না মঞ্চে, সেদিন না, আর কোনোদিনই না।

অল্পদিন আগে চৈতন্যের ভূমিকায় জগৎ মাতিয়েছেন, বাঙালি দর্শককে আমূল চমকে দিয়ে পরপর অভিনয় করেছেন 'বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দনন্দিনী আর 'সধবার একাদশী'-র কাঞ্চন চরিত্রে, একই নাটকে অভিনয় করেছেন তিলোত্তমা আর আয়েষার ভিন্নমুখী দুই দুর্গেশনন্দিনী চরিত্রে, এমনকী, একই সন্ধেয় অভিনয় করেছেন চৈতন্যদেব আর বিলাসিনী কারফরমা-র মতো দুই বিপ্রতীপ ভূমিকায়; 'বেল্লিক বাজার' নাটকের অকিঞ্চিৎকর এক 'রঙ্গিণী' চরিত্রে শেষ অভিনয় করে মঞ্চ ছেড়ে গেলেন বাংলা নাটকের সেই অবিসংবাদী নায়িকা, বাংলার রঙ্গমঞ্চ আর কোনোদিন ফিরে ডাকল না তাঁকে।

২. মেয়েটাকে বেচে দিলেন, বাবু?

বেণি। কোথায় থাকো, আঙুর? এদিকে আমাদের চিঁড়েদই পেকে উঠেছে? ... নিজেদের থিয়েটার! নিজেদের থিয়েটার হবে। (বসুন্ধরা ও ময়না হর্ষধ্বনি করে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।)

বসু। দাঁ বাবু বলে গেল বুঝি?

বেণি। হ্যাঁ, আর বীরকেষ্ট সে-থিয়েটারে থাকছে না। ...

ময়না। আমি কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা দেব। শয়তানটা এমনভাবে তাকায় মনে হয় আমার জামা নেই।

বসু। জানিস ময়না? বাবুতে আমাতে আর হরবাবুতে মিলে চার বছর আগে থেটার-বাড়ির নকসা করিয়ে রেখেছি। এইবার শিকে ছিঁড়েছে। সে কি হৌস, কি সাজঘর, কি এস্টেজ - তুই ভাবতে পারবি না।

প্রিয়। স্টপ ইট। কালনেমির লঙ্কাভাগটা পরে করবেন। আগে জিজ্ঞেস করুন, কী মূল্যে বেণিবাবু থিয়েটার কিনছেন। (নীরবতা। বেণি গড়গড়ার নল তুলে নেন।)

বসু। কী মূল্য, কাপ্তেনবাবু?

বেণি। বিনামূল্যেই বলা যায়। ময়না বীরকেষ্টর ধোপাপুকুরের বাড়িতে থাকবে - ব্যস। (ময়না অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে)

বসু। (বজ্রাহতের মতন) মেয়েটাকে বেচে দিলেন, বাবু?

উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকের এইসব সংলাপ বাংলা সাহিত্যের সমস্ত পাঠকের যতটা চেনা আজ, ততটাই চেনা বোধহয় তাঁদের, ময়নার আদলেই সেদিনের 'প্রাইমা ডোনা অফ বেঙ্গলি স্টেজ' বিনোদিনীকে থিয়েটারের জন্য 'বেচে দেওয়ার' আখ্যানটিও; কিংবা, সেকালীন বাংলাদেশের ভদ্রলোক বাবুদের অনেকেরই একান্ত আপন এক শর্তে সুচারুভাবে 'বেচে দেওয়ার' সে-কাজটি সুসম্পন্ন করবার ইতিকথাটিও খুব অজানা নয় তাঁদের, যে ইতিকথা প্রায় মিথের মর্যাদায় অবিচল হয়ে রয়েছে আজও, বিনোদিনীর জন্মের সার্ধশতবর্ষেও। সেদিনের ভদ্রলোকেরা যে এমনভাবে বিনোদিনীকে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন তার কারণ হয়তো, বড়ো অভিনেত্রী হিসেবে বিনোদিনীর বর্তমান যতখানি সত্য ছিল তাঁদের কাছে, জন্ম-পরিচয়ে তাঁর বারাঙ্গনা-উৎসের অতীতটিও তার চেয়ে কিছু কম সত্য ছিল না তাঁদের কাছে, তবে কেন বিনোদিনীর মতো এমন পণ্য হাতে থাকলে ভাবতে পারবেন না বেণীমাধবের মতো গিরিশচন্দ্রেরাও,

বেণি। থিয়েটারের জন্য সব করতে পারি, করে এসেছি, করে যাবো। বীরকেষ্ট বলেছে, ময়নাকে পেলে সে থিয়েটার গড়ে দেবে। ময়নার মতন মূলধন আমার হাতে থাকতে এত বড় দাঁও ছেড়ে দেব?

এইখানেই সমান্তরাল এক ধারায় বয়ে চলেছে সেদিনের অঙ্কের হিসেব, প্রখর বিষয়ীর যুক্তি আর প্রবল ভাবাবিষ্টের আবেগের হিসেব। একপক্ষের মনে রয়েছে, 'টিনের তলোয়ার' নাটকের বসুন্ধরার ভাষায়, 'মূলধন, দাঁও, ব্যাবসা'-র লেনদেনের কথা, আর অন্য পক্ষ, বিনোদিনীর একলা মনে কেবলই রয়েছে আবেগ, থিয়েটারের জন্য আবেগ, মঞ্চমায়ার জন্য আবেগ, অবাঞ্ছিত সমাজকোণের প্রান্তিকতা থেকে উঠে এসে সমাজের কেন্দ্রবর্তী মানুষগুলোর প্রশংসামাখা মুগ্ধতার সামনে সম্রাজ্ঞীর মতো নিজেকে মেলে ধরার আবেগ। যুক্তি আর আবেগের সংঘাতের এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যখন বসুন্ধরার মতো কেউ ফিসফিস করে উঠেছে বিনোদিনীর বুকের মাঝে, চেয়েছে থিয়েটার ছেড়ে গিয়ে সংসার, সন্তান, অসম্পূর্ণ স্বপ্নের পূর্ণতা, বাস্তবের গোলাপসুন্দরী-সুকুমারীর জীবনচরিতের একের পর এক পাতা উল্টে গিয়েছে মনের মধ্যে, প্রিয়নাথের মতো কেউ গভীর গহন মনের কোণে বসে বলতে চেয়েছে, 'রং-কাঠ চট-আলো-জরির' এই মায়াময় জগৎটাই আসল জগৎ নয়, তখন, তখনও, ময়নার মতোই হয়তো কোনোদিন বিনোদিনীরও মনে হয়েছে,

> আমি কলকেতাকে পেয়েছি হাতের মুঠোয়। আমি ঐ বাবুদের পেয়েছি পায়ের তলায়। আর অভিনয় করে আমি কখনো হয়েছি রাজকুমারী, কখনো নবীনা তপস্বিনী, কখনো বা রুদ্ররোষ সম্রাজ্ঞী রিজিয়া। সেসব আমি ছাড়বো না।

প্রবল আবেগেরও একটা হিসেব থাকে, বিনোদিনীরও ছিল, নাহলে বিমুগ্ধ প্রণয়ীর তাঁকেই নিবেদন করতে-চাওয়া 'অর্ধ লক্ষ টাকা'-র প্রলোভন তিনি ছাড়তে পেরেছিলেন কী করে? পঞ্চাশ হাজার টাকার অঙ্কটা তো খুব সামান্য ছিল না ১৮৮২ সালে, আর বিনোদিনীর পটভূমিকা থেকে উঠে আসা একটি মেয়ের পক্ষে, মাত্রই কয়েক বছর আগে যাঁর থিয়েটারে আসবার মতো একটি ভদ্রস্থ জামা ছিল না, দেহপট সনে কেবল নটজীবন হারানোর নয়, হয়তো দিনযাপনের গ্লানিরও অবসানের সূচনা হতে পারত যাঁর; এমন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে হাতে নিয়েই তো একটা বাজি ধরেছিলেন বিনোদিনী, একদিকে রেখেছিলেন অর্ধ লক্ষ টাকায় কেনা এক জীবনের নিশ্চিন্ততা আর অন্যদিকে, ইংরেজি একটিমাত্র অক্ষরে জড়িয়ে থাকা চিরজীবনের একটি নাম; কোনো এক মানদণ্ডে তাঁর কাছে তো তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল কেবল এক জীবনের আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ভাবনা, বেছে নিয়েছিলেন তিনি ইংরেজি বর্ণমালার ওই দ্বিতীয় অক্ষরটিকেই, তাঁর দুঃখী জীবনের অর্ধ লক্ষা টাকায় কেনা একটি অক্ষর, তাঁর নামের আদ্যক্ষর — 'বি'; জীবনভর অনেক ঠকতে ঠকতেও তাঁর শিক্ষাগুরুদের বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন বিনোদিনী, বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন, যতদিন বঙ্গরঙ্গালয় থাকবে, তাঁরই নামের একটি ভগ্নাংশে জড়িয়ে থাকবে বাঙালি সংস্কৃতির এক টুকরো ইতিহাস, জড়িয়ে থাকবে এই তথ্যটুকু যে, নগর কলকাতার বুকে একদিন গড়ে উঠেছিল 'বি-থিয়েটার', আক্ষরিক অর্থে ওই 'বি'-র অস্থি-মেদ-মজ্জার মূল্যে ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল যে থিয়েটারের।

কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোকের দ্বিচারিতা, বাংলার বাবুসমাজের কপটতা পরিমাপ করবার কতটুকু ক্ষমতা ছিল বিনোদিনীর মতো সামান্যা এক নগরনটীর? আভিজাত্যে-বিত্তে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে বিনোদিনীর চেয়ে শতগুণে সম্ভ্রান্ত সে মানুষগুলোর পক্ষে কি এতটুকু কঠিন হয়েছিল বিনোদিনীকে ঠকানো? যে থিয়েটারে চিরকালের মতো তাঁর নাম জড়ানো রইল বলে থিয়েটারের প্রস্তুতিপর্বে সানন্দে স্বেচ্ছাশ্রমে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে মাটি বইলেন বিনোদিনী, রেজিস্ট্রেশনের দিন অপেক্ষায় রইলেন আকাঙ্ক্ষায় আনন্দে উদ্বেল হৃদয়ে, কী অনায়াসেই নাট্যনিবেদিতপ্রাণ মান্যগণ্য মানুষেরা সে-থিয়েটারের নাম রেখে এলেন 'স্টার থিয়েটার'! বারাঙ্গনার নামের

একটি অক্ষরের ভার সইল না তাঁদের, নির্মমভাবে মুছে দিলেন 'বি-থিয়েটার'-এর সমস্ত সম্ভাবনা, কেবল কি একটি বারাঙ্গনার স্পর্ধাকেই উচিত শাস্তি দিলেন তাঁরা, অসম্মান করলেন না দাতা গুর্মুখ রায়ের আন্তরিক ইচ্ছেকেও, যিনি নাটক ভালোবেসে নয়, কেবল নাটক ভালোবাসে এমন একটি মানুষকে ভালোবেসে তারই জন্য গড়ে দিতে চেয়েছিলেন নিজস্ব থিয়েটার?

বিনোদিনীর ক্ষোভের আরও কারণ ছিল এই ভালোবাসার প্রশ্নেই। গুর্মুখ রায় তাঁর জীবনে আসবার আগেই এক জমিদারতনয় ছিলেন বিনোদিনীর আশ্রয়, তাঁকেই ভালোবেসেছিলেন বিনোদিনী, কাশীতে গঙ্গার জল স্পর্শ করে বিনোদিনীকে বিবাহের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন বিনোদিনীর সেই মনের মানুষটি; সেই জমিদারতনয়ও বাবুসমাজেরই আর একজন প্রতিনিধি, সময়কালে সত্যভঙ্গ করতে দেরি হয়নি তাঁর। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার মোহে অনায়াসেই তিনি বিনোদিনীকে লুকিয়ে বিবাহের সাত পাকে জড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন নিজেকে। তবে অভিজাত ভদ্রলোকটি তাঁর সত্যরক্ষা না করলেও 'পতিতা' বিনোদিনীর মন সেদিন কিছুতেই সায় দেয়নি এক পুরুষের আশ্রয় থেকে অন্য পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, এক্ষেত্রে নিবেদন-আকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় বিত্তবান পুরুষটিরই নাম ছিল গুর্মুখ রায়। 'বারাঙ্গনা' বিনোদিনীর এ মনোভাব নিশ্চয়ই বিস্ময় জাগিয়েছিল সমকালে, বিনোদিনীর কলমে তাই শুনতে পাই,

> একের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের চিরপ্রথা হইলেও এ অবস্থা আমায় বড় চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়াছিল। হয়তো লোকে শুনিয়া হাসিবেন যে আমাদেরও আবার ছলনায় প্রত্যবায় বোধ বা বেদনা আছে। যদি স্থিরচিত্তে ভাবিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন যে আমরাও রমণী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তখন নারী-হৃদয়ের সকল কোমলতায় তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই, সকলই দিয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি!... পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন?

তবু গুর্মুখ রায়কে প্রতারণা করতে চাননি বিনোদিনী, চাননি সত্যভঙ্গকারী হলেও 'একের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপরের আশ্রয়গ্রহণ' করতে, তবে শেষ পর্যন্ত গুর্মুখ রায়ের দাবি মানলেন কেন বিনোদিনী? এর একটা উত্তর কি শোনা যায়, 'টিনের তলোয়ার' নাটকে ময়নার এই কণ্ঠস্বরে,

> ময়না। পারবো না। থিয়েটার ছাড়া বাঁচবো না। এরাই পিতামাতা, ভাইবোন, সব। এদের পথে বসিয়ে চলে যেতে পারবো না।...

আর বিনোদিনীর কলম জানিয়েছিল,

> থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম। কেন করিব না? যাহাদের সহিত চিরদিন ভাই ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চিরবশীভূত, তাহারাও সত্য কথাই বলিতেছে। আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় কাটিবে। সংকল্প দৃঢ় হইল, গুর্ম্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম।

'আমরাও রমণী' — অনেক পরিতাপে পাঠককে এ-কথা যিনি মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন, 'নারী-হৃদয়ের কোমলতা'-র ওপর নির্ভর করে এ-সিদ্ধান্ত সেই বিনোদিনীর, নারীমনের গভীরে তাঁর যে শিল্পী মনের বাস, থিয়েটারের জন্য যার প্যাশনের শেষ নেই, এ সিদ্ধান্তও তারই; এই সিদ্ধান্তের সকরুণ বলিষ্ঠতায় কেবল নারীসত্তাটুকুকে ডুবিয়ে দিয়ে জেগে উঠেছেন অভিনেত্রী বিনোদিনী, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন শিল্পী বিনোদিনী।

তবু কেন স্টার থিয়েটারের নাম 'বি-থিয়েটার' রাখা গেল না, বিনোদিনীর এত আত্মত্যাগের, এমনকী, এইরকম আত্মদানের পরেও, সে বিষয়ে যুক্তির অভাব নিশ্চয়ই ছিল না সেইসব নাট্যনিবেদিতপ্রাণ মানুষদের; আর সত্যি কে-ই বা অস্বীকার করতে পারে তাঁদের যুক্তি, কম কালিমা নাকি বিনোদিনীর গায়ে, কে বলবে বিনোদিনীর নৈতিক চরিত্র সংশয়ের ঊর্ধ্বে, আর কে না জানে বাঙালি দর্শকের স্বভাব, অভিনেত্রী বিনোদিনীর একটি রাতের অভিনয় দেখতে তারা জড়ো হবে দলে দলে, ভিড়ের চাপে ভেঙে ফেলবে প্রেক্ষাগৃহের দরজা, কিন্তু তারা একজনও নাকি এসে দাঁড়াবে না এমন একটি থিয়েটারের দরজায়, যা বিনোদিনীর নামাঙ্কিত বা, যার মালিক বিনোদিনী! যদি প্রশ্ন ওঠে, এই যুক্তি যদি ছিলই তাঁদের মনে, তবে আদৌ বিনোদিনীর মূল্যে অর্জিত টাকায় থিয়েটার তাঁরা গড়লেন কেন? প্রশ্নটা খুব সহজ, আর উত্তরও তো জানাই, নিজস্ব থিয়েটারের স্বপ্নপূরণের বিকল্প পথ আর ছিলই বা কোথায়, বীরকৃষ্ণ দাঁ বা প্রতাপচাঁদ জহুরীদের মালিকানা থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন সাধ তো ছিল সকলেরই, আর তাছাড়া, কালিমা যা কিছু সবই বারাঙ্গনা বিনোদিনীর জীবনে-যাপনে, তাতে তো আর দাগ লাগে না তাঁর অর্জিত অর্থে। তবে যত জোরালোই মনে হোক, এ যুক্তি বিনোদিনী মানবেন বলে হয়তো মনে হয়নি স্টার থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিদের, তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিনোদিনীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই সম্পন্ন হয়েছিল নতুন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা।

কান পেতে শুনতে চাইলে আজও শোনা যায়, বিনোদিনীর 'আমার কথা'-য় তাঁর গুমরে ওঠা বয়ান,

> যে পর্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজিস্ট্রি না হইয়াছিল, সে পর্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে 'নাম' হইবে। কিন্তু যে দিন উহারা রেজেস্ট্রি করিয়া আসিলেন তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহকয়েক বাকী; আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল? দাশুবাবু প্রফুল্লভাবে বলিলেন যে 'স্টার'। এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিট কাল কথা কহিতে পারিলাম না। কিছু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, 'বেশ'। পরে মনে ভাবিলাম যে উহারা কি শুধু আমায় মুখে স্নেহ-মমতা দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিলেন? কিন্তু কি করিব, আমার আর কোন উপায় নাই। আমি তখন একেবারে উঁহাদের হাতের ভিতরে। আর আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমনভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এত টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট না হইয়াছিল তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অতিশয় মনোকষ্ট হইয়াছিল যদিও এ সম্বন্ধে আর কখন কাহাকেও কোন কথা বলি নাই, কিন্তু ইহা ভুলিতেও পারি নাই, ঐ ব্যবহার বরাবর মনে ছিল।

খুব সংগত কারণেই এ অভিমান বিনোদিনীর, সমাজে মাননীয় মানুষদের এত মিথ্যাচার, এত প্রবঞ্চনা, এমনি করে 'বি থিয়েটার'-এর ভিতের উপর দাঁড়িয়ে, স্টার থিয়েটার-এর জন্ম, তবু তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন বিনোদিনী, 'দক্ষযজ্ঞ'-এর সতী থেকে হয়ে উঠেছিলেন 'চৈতন্যলীলা'-র নিমাই, তবু স্টার ছেড়ে যেতে হল বিনোদিনীকে।

বিনোদিনীর জন্যই বহু ব্যয়ে থিয়েটার গড়েছিলেন গুর্মুখ রায়, ব্যক্তিগত অসুস্থতা, পরিবার এবং মাড়োয়ারি সমাজের প্রবল চাপে এই প্রেমিক পুরুষটি যেদিন নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন থিয়েটারের জগৎ থেকে, বিনোদিনীর সান্নিধ্য থেকে, সেদিনও স্টার-এর অর্ধেক মালিকানা তিনি লিখে দিতে চেয়েছিলেন বিনোদিনীকেই। বিনোদিনীর হয়তো আর অনিচ্ছা ছিল না সে-দান গ্রহণে, এ-সবই তো তাঁর বারাঙ্গনা জীবনের আবশ্যিক গ্লানি থেকে মুক্ত একক জীবনে উত্তরণের পাথেয়, কিন্তু সে-পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, তিনিই নিরস্ত করেছিলেন বিনোদিনীর মাকে, বুঝিয়েছিলেন,

> বিনোদের মা ওসব ঝঞ্ঝাটে তোমাদের কাজ নাই, তোমরা স্ত্রীলোক অত ঝঞ্ঝাট বহিতে পারিবে না। ...আমরা কার্য্য করিব; বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই। গাধার পিঠে বোঝা দিয়া কার্য্য করিব।

গিরিশচন্দ্রের মতামতকে অবহেলা করতে চাননি বিনোদিনীর মা, চাননি তাঁর ইচ্ছাকে অতিক্রম করতে, তাই কোনো মতেই রাজি হননি স্টার-এর অংশীদারিত্বে, রাজি হতে দেননি বিনোদিনীকেও। কী ভেবেছিলেন সেদিন বিনোদিনী বর্ণিত 'উঁহারা'? এক বারাঙ্গনা, সে যতই নাট্যামোদী হোক, সমকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হোক, হোক 'ফ্লাওয়ার অফ নেটিভ স্টেজ', তার পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করা যায় হয়তো, তার অভিনয়ে মুগ্ধ হলে হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানানোও যায়, তাই বলে তার মালিকানায়, তার অধীনে রঙ্গালয়ে কাজ করা কি যায়, প্রতিদিন?

তাই এই সব কিছুর পর, বিনোদিনী যাতে 'উক্ত থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেত্রী'-র মর্যাদাটুকুও না পান, তার প্রয়াসও শুরু হল যখন স্টার থিয়েটারে, তখন আর পথ কোথায় বিনোদিনীর সামনে, ভরা যৌবনে, ক্ষমতার শীর্ষে দাঁড়িয়ে মঞ্চের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে জনারণ্যের অন্ধকারে মিশে যাওয়া ছাড়া? বিনোদিনীর দেহপট কান্তি হারায়নি তখনও, মন অভিনয় ভোলেনি এতটুকু, তবু। রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার সেই মুহূর্তটি নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাসে বড়ো সংযত উচ্চারণে ধরা আছে বিনোদিনীর এই সংক্ষিপ্ত কথা ক-টিতে,

> যাঁহারা একসঙ্গে কার্য্য করিবার কালীন সমসাময়িক স্নেহময় ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, সখা ও সখী ছিলেন, তাঁহারা ধনবান উন্নতিশীল অধ্যক্ষ হইলেন। বোধহয়, সেই কারণে অথবা আমারই অপরাধে দোষ হইতে লাগিল। কাজেই আমায় থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল।

৩. কলঙ্কিনীর কলম

> বিনোদিনী তখন প্রায়ই থিয়েটার দেখতে আসতেন। যথেষ্ট বৃদ্ধা হয়েছেন কিন্তু থিয়েটার দেখবার আগ্রহটা যায় নি। নতুন বই হলে ত উনি আসতেনই, এক কর্নার্জ্জুন যে কতবার দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। .... এসে উইঙ্গসের ধারে বসে পড়তেন। অমনি, আমাদের মেয়েরা, যে যেখানে থাকতো, সবাই আসত ছুটে, একটা মোড়া এনে পেতে দিতো, আর 'দিদিমা' বলে ওঁকে একেবারে ঘিরে ধরত। কথা বলতেন খুব কম। থিয়েটারের সবাই খুব সম্ভ্রম করতেন ওঁকে। ... শুনেছি বাড়িতে পুজো-অর্চনা লেগেই আছে, তবু থিয়েটার দেখতে ওঁর ঠিক আসা চাই।

অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিকথা 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'-র প্রথম পর্বে ধরা আছে পরিণত বয়সে স্টার থিয়েটারে বিনোদিনীর নিয়মিত নাটক দেখতে আসবার এই ছবিটি; 'আমার অভিনেত্রী জীবন' লিখতে শুরু করেও বিনোদিনী নিজেই জানিয়েছিলেন,

> আজ-কালকার থিয়েটার মাঝে মাঝে দেখি; কেমন নেশা। সব কাজের মধ্যেও থিয়েটার যেন টানে। দেখি, আজকালকার সব নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী, সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, কত নতুন নাটক, কত দর্শক, কত হাততালি, সোরগোল, হৈ হৈ, সেই ফুটলাইট — সেই দৃশ্যের পর দৃশ্য - সেই যবনিকা পড়ার সময় ঘন্টার ঢং ঢং শব্দ, আর কত কথাই না মনে পড়ে।

রঙ্গালয় ছেড়ে যাওয়ার প্রায় চার দশক পার হয়ে এসে এ-লেখায় সেই জীবনটির কথাই লিখতে শুরু করেছিলেন বিনোদিনী, যাকে তিনি ভোলেননি, ভুলতে পারেননি, একদিন যাকে ভালোবেসেছিলেন 'প্রাণের সবটা দিয়ে', লিখেছিলেন,

> আমরাও তো একদিন এমনি করে সাজতেম, সেই সেকালের মত দর্শক, সেই সেকালের মত রঙ্গসাথী, সেকালের সাজপোষাক,

সেকালের নাটক, সেকালের গ্যাসের ফুটলাইট, সেকালের আবহাওয়া। দুর্ব্বল স্মৃতি সেকালে অতীতের কোন স্বপ্নরাজ্যে টেনে নিয়ে যায়; মনে হয় সেদিনকার কথা সব গুছিয়ে বলি — যাকে ভুলি নি, ভুলতে পারি নি, যাকে সত্যিই প্রাণের সবটা দিয়ে ভালবাসতেম, আজও যার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি নি, তার কথা আজকার নব অভিনেত্রীদের কাছে গল্প করি। কিন্তু সব কেমন গুলিয়ে যায়। যাক্। তবু আমি সে দিনের কথা কিছু বলবো, বলবার চেষ্টা করবো। সরল, সত্য কথা; যা পড়ে আজ কালকার পাঠক ও দর্শক বুঝবেন, কি মাটির তাল নিয়ে, পুকুর থেকে পাঁক তুলে — এদেশে যাঁরা থিয়েটারের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা কেমন সব পুতুল গড়েছিলেন; এবং তাঁদের হাতের সে গড়া পুতুল কি করে কথা কইতো, স্টেজের উপর চলতো ফিরতো, দর্শকগণকে আনন্দ দিত, তৃপ্তি দিত।

'আমার অভিনেত্রী জীবন' নামে বিনোদিনীর এই আত্মকথন প্রকাশ পেয়েছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায়, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই স্মৃতিকথাটির প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৩৩১ বঙ্গাব্দে। বিনোদিনীর আত্মকথা রচনার প্রথম সূচনা অবশ্য অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায়, ১৩১৭-র ভাদ্র এবং আশ্বিন-কার্তিক — এই দুই সংখ্যায় প্রকাশিত 'অভিনেত্রীর আত্মকথা' নামে সে রচনাটি অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছিল পত্রিকার পাতায়। এরপর, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছিল বিনোদিনীর আত্মকথার প্রথম খন্ড 'আমার কথা'। পরের বছর ১৩২০-তেই প্রকাশিত হয়েছিল তার নব সংস্করণ। 'আমার কথা'-র একটা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছেও ছিল বিনোদিনীর, যদিও সে সাধ অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল তাঁর।

'রূপ ও রঙ্গ' নামে এই জনপ্রিয় পত্রিকাটিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিনোদিনীর অভিনেত্রী-জীবনের অসামান্য ডকুমেন্টেশনটির প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায় অর্ধপথেই, মাঝে কয়েকটি সংখ্যা বাদ দিয়ে মোট ১১টি কিস্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল বিনোদিনীর নিজের মুখে বলে যাওয়া নিজের অভিনেত্রী-জীবনের এই বিবরণীটি; কিন্তু উত্তরকালের পাঠকের মনে একটাই প্রশ্ন জাগে আজ, ১৩৩২-র ২৬ বৈশাখ সংখ্যার পর যখন আকস্মিকভাবে থেমে গেল বিনোদিনীর কলম, আর ঠিক পরের সংখ্যা থেকেই শুরু হল অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'-এর ধারাবাহিক প্রকাশ, তখন বিনোদিনীর কলমের এই হঠাৎ থেমে যাওয়া সম্পর্কে একটি শব্দও কেন একটিবারও উচ্চারণ করলেন না জনপ্রিয় পত্রিকাটির সম্পাদকদ্বয়? পাঠকদের কাছে সম্পাদক হিসেবে সেটুকু কি তাঁদের ন্যূনতম দায়িত্ব ছিল না সেদিন? এই কথাটা আরও মনে হয় এই জন্যই যে, এই ঘটনাই তো এর আগেও ঘটেছিল অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'নাট্যমন্দির' পত্রিকার ক্ষেত্রেও, এমনি করেই তো একদিন নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল 'অভিনেত্রীর আত্মকথা'-রও প্রকাশ।

কেউ স্পষ্ট করে বলেনি কখনো, তবু আজকের পাঠকের বারেবারেই মনে হয়, বাংলার নাট্যজগতে এক হিরণ্ময় নীরবতার দুর্বহ ভার যেন ঘন হয়ে জমতে থাকে বিনোদিনীর নিষ্ক্রমণ ঘিরে, নীরবতার এক রাজনীতি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে তাঁর লেখালেখির পাতার পর পাতা জুড়েও। বিনোদিনীর নিয়মিত থিয়েটার দেখতে আসবার ওই যে ছবিটি দেখি অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিকথায়, ওই যে শুনি, বিনোদিনী এলেই থিয়েটারের মেয়েরা ছুটে আসত সবাই, মোড়া এনে পেতে দিত তাঁর জন্য, ঘিরে ধরত তাঁকে, থিয়েটারের সবাই খুব সম্ভ্রম করতেন তাঁকে, এই ছবিটাও ১৩৩১ বঙ্গাব্দেরই, যখন 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'আমার অভিনেত্রী জীবন' লিখছেন বিনোদিনী; তারপর কবে থেমে গেল তাঁর সে লেখা, প্রায় দু-দশক তারপরেও বেঁচে ছিলেন বিনোদিনী, নিজের একলা জীবনে। ১৯৪১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সবার চোখের আড়ালে নিঃশব্দ প্রয়াণ বিনোদিনীর, খুব ভুল হবে কি, আজ যদি কারও মনে প্রশ্ন জাগে, বেঁচে থাকতেই কি বিনোদিনীকে ভুলে গিয়েছিল তাঁর সমকাল?

যে কথা শুনতে চাই না, শুনতে দিতে চাই না, তেমন কোনো কথা কি তবে কখনো বিনোদিনী উচ্চারণ করে ফেলেছেন তাঁর স্মৃতিকথনে? তাই এমন নিরুত্তাপ উদাসীনতায় ঘেরা তাঁর ঋদ্ধিময় স্মৃতি? নইলে তাঁর গুরু গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনীর লেখালেখি প্রসঙ্গে মাত্র দু-বারই কলম ধরেছিলেন যিনি, (প্রথমবার লিখেছিলেন 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় বিনোদিনীর অসমাপ্ত আত্মকথনের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হিসেবে 'কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়', আর দ্বিতীয়বার, বিনোদিনীর অনুরোধে তাঁর 'আমার কথা' নামে বইটির অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এক ভূমিকা) সেই তিনি কেনই বা লেখেন,

> বিনোদিনী মনের কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়া সহানুভূতি চাহিয়াছে; কিন্তু দেখা যায় কোথাও কোথাও সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। ... যে অবস্থা গোপন রাখা আত্মজীবনী লেখার কৌশল, সে কৌশল ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

'আমার কথা'-র ভূমিকা প্রবন্ধ 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী' শীর্ষক লেখাটিতে এই কথাগুলি লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র। অবশ্য, 'আমার কথা' আর 'আমার অভিনেত্রী জীবন' নামে বিনোদিনীর যে দুটি আত্মজীবনকথার পাতা উল্টোবার সুযোগ পান আজকের পাঠক তাতে তাঁর পক্ষে বিনোদিনীর শিক্ষাগুরুর এই মন্তব্যের কারণ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। বিনোদিনীর যেটুকু লেখালেখি এসে পৌঁছেছে তাঁর উত্তরকালের হাতে, সেইটুকুই খুব প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেয়, বিনোদিনী কোনোদিন অস্বীকার করতে চাননি তাঁর জীবনে জড়িয়ে থাকা বারাঙ্গনার গ্লানিচিহ্ন, আত্মজীবনকথার পাতায় পাতায় অনায়াসে ছড়িয়ে রেখে গেছেন তাঁর অকপট মনের অজস্র অভিজ্ঞান, ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে লুকোনো ভণ্ডামিকে চেনবার ক্ষমতা, অথবা সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, সমস্তই প্রকাশ পেয়েছে বিনোদিনীর স্পষ্ট অকৃত্রিম ভাষার শক্তিতে, সত্যকে আড়াল করার কৌশলের কোনো প্রয়োজনই ছিল না তাঁর দ্বিধাবিহীন জীবনে, তাই হয়তো বিনোদিনীর জেনে নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি, কোন 'অবস্থা গোপন রাখা আত্মজীবনী লেখার কৌশল', আর কেমন করে তাঁর কলম ক্ষুণ্ণ করেছে সে কৌশল।

আজকের পাঠক বরং গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখে, 'আমার কথা' আর 'আমার অভিনেত্রী জীবন' এক যুগের ব্যবধানে লেখা এই দুটি আত্মস্মৃতির টুকরো পাতায় অভিজ্ঞতার অনেক সদৃশ্যতা আছে বিনোদিনীর বয়ানে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য তফাত ধরা দিয়েছে অনেকটা সময়ের ব্যবধানে বিনোদিনীর বদলে যাওয়া বাগভঙ্গিতে, বর্ণনার সাধু-রীতি চলিত-এ বদলে গেছে অবশ্যই, আর তা হওয়ার ফলে অনেকখানি আড়ষ্টতামুক্ত হয়েছে বিনোদিনীর ভাষার লাবণ্য, কিন্তু বদল কেবল সেইটুকুই নয়, সময়ের প্রলেপে অনেক ঘটনাকে ঘিরে বিনোদিনীর ক্ষোভ যন্ত্রণা প্রশমিত হয়েছে অনেকটা, সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়ে অনেক পরিণত দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনার যথার্থ মাত্রাকে দেখতে শিখেছেন বিনোদিনী; সবচেয়ে বড়ো কথা, 'আমার কথা'-র আমিটিকে যেন অনেকটাই পরিহার করে নিরাসক্ত এক দ্রষ্টার বয়ানকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন বিনোদিনী তাঁর এই পরিণত কলমে।

তবে, ঘটমান সময়ের ঘূর্ণাবর্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রথম যুগের লেখার পাতা উল্টেও বিনোদিনীর কলমে অপরিণতির কোনো চিহ্ন খুঁজে পায় না আজকের পাঠক, বরং সে দেখে, জীবনভর মুখের আড়ালে কত না মুখোশের ছবি দেখতে দেখতেই কীভাবে নিজের আত্মজীবনীর পাঠক নির্বাচন করে নিয়েছেন বিনোদিনী, 'আমার কথা'-য় লিখেছেন,

> যাঁহারা এই ক্ষুদ্র লেখা দেখে ঘৃণা বা উপহাস করিবেন, তাঁহারা যেন এ পুস্তক পাঠ না করেন। কেন না রমণী জীবনে যাহা প্রধান

ক্ষতস্থান তাহাতে লবণ দিয়া নাই বিরক্ত করিলেন। যাঁহারা দুঃখিনী হতভাগিনী বলিয়া একটুখানি দয়া করিয়া সহানুভূতি দেখাইবেন তাঁহারা যেন এ হৃদয়ের মর্ম্ম ব্যথা বুঝেন।

কিন্তু সত্যিই কি তাঁর নিরবধিকালের পাঠকের কাছে কেবল 'দুঃখিনী হতভাগিনী' বলে এতখানি দয়া আর সহানুভূতিই প্রার্থনা করেছেন বিনোদিনী? মাত্র কয়েকটি পংক্তি পার হতে না হতেই আজকের পাঠক তো দেখে, ওই দুঃখিনী হতভাগিনীদের 'ঘৃণিত' জীবন ঘিরে কী তীক্ষ্ণ তর্ক তুলতে পারে বিনোদিনীর কলম, কীভাবে তিনি লেখেন,

বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে? কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয়? জননী জঠর হইতে তো একেবারে ঘৃণিতা হয় নাই? জন্ম মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদের জন্মের জন্য তাহারা দোষী হইতে পারে না। ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে? হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে? কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চির কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাঁহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নন কি? ...দোষ কাহাদের? যে সকল হতভাগিনীরা সুধাবোধে বিষপান করিয়া চিরজীবন জর্জরিত হইয়া হৃদয়-জ্বালায় জ্বলিয়া মরে, তাহাদের কি?

খুব ভুল বলেননি গিরিশচন্দ্র, এইসব কথা এমন মর্মন্তুদ ভাষায় লেখবার সময়ে তো সত্যিই 'সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ'-ই করেছেন বিনোদিনী, কিন্তু আপন 'ঘৃণিত' জীবনের মর্মদাহ ভুলবেন কেমন করে বিনোদিনী, কেমন করে ভুলবেন একমাত্র কন্যা শকুন্তলাকে স্কুলে পাঠানোর সেই করুণ প্রয়াসমুহূর্তগুলি। নীচকুলোদ্ভবা তাঁর কন্যা, একমাত্র এই যুক্তিতেই প্রতিটি বিদ্যালয় যখন দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল শিক্ষার্থী বালিকাটির মুখের ওপর, সমাজে যাঁকেই কখনো বন্ধু ভেবেছেন বিনোদিনী, তাঁকেই সে-সময়ে কন্যার শিক্ষার্জনের জন্য অনুরোধ, এমনকী, অনুনয়ও করেছেন বিনোদিনী, তবু সাধ তো পূরণ হয়ইনি তাঁর, বিনোদিনীর কন্যার বিদ্যালয় প্রবেশে বরং যথাসম্ভব বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সেই 'বন্ধু'-রাই। এরপরেও বিনোদিনীর কলম ঝলসে উঠবে না তীব্র কটাক্ষে? খুঁজবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে 'আত্মজীবনী লেখার কৌশল'?

অথচ কৌতুকে কতখানি লাবণ্যময় হয়ে উঠতে পারে বিনোদিনীরই ভাষা, তারও পরিচয় ধরা আছে তাঁর 'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এ, বালিকাবেলার গল্প বলছিলেন তখন বিনোদিনী, বলছিলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সেই উত্তরভারত ভ্রমণের কাহিনি, বৃন্দাবনে একলা ঘরে জানলার ধারে বসে আপন মনে সেদিন খাচ্ছিলেন বিনোদিনী, তারপরের ঘটনা শোনা যাক বিনোদিনীর মুখেই,

এক কামড় খেইছি; দেখিনা, একটা বাঁদর এসে জানালার ওপারের ছাদের উপর বসে হাত পেতে খাবার চাইছে। কৌতূহল হল, তাকে একটু খাবার ভেঙে দিলাম। ব্যস, আর কোথায় আছি; দেখতে দেখতে একে একে, দুইএ দুইএ বানর এসে ছাদে জমতে লাগল। আমারও উৎসাহ সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগলো। আমি তাদের সকলকেই খাবার দিতে আরম্ভ করলাম। খানিক পরে দেখি ওদিককার ছাদে একপাল বাঁদর — আর এদিকে আমার খাবারের চুবড়ী খালি। দু'একটা বাঁদর জানালার গরাদে ধরে নাড়া দিতে লাগলো। আমি ভয়ে অস্থির। নিরুপায় হয়ে কেঁদে ফেললাম। বাঁদর কিন্তু আমার কান্নার মর্ম্ম কিছুই বুঝল না। কোন বাঁদরই বোধহয় বুঝে না। সেই লাফালাফি, দাপাদাপি, আর হাত পেতে খাবার চাওয়া। আমি যত বলি, 'ওরে বাপু, আমার ভাঁড়ারে আর কিছু নেই' তারা তত লাফায় আর দাঁত খিঁচোয়। ছাদে বাঁদর আর ঘরের মধ্যে আমি, ঐ বাঁদরদেরই মত একজন, সব খাবার বিলিয়ে দিয়ে কাঁদছি....

তবে কেবল নিজের সীমাবদ্ধ জীবনকথা, অভিনয়জীবনের সিদ্ধি আর অনর্জনের দাহের বিবরণের মধ্যেই

আবর্তিত হয়নি লেখিকা বিনোদিনীর কলম। যে মাটিতে দাঁড়িয়ে বাইরের জগৎকে ছুঁয়েছেন তিনি, সেই মাটির কথাই তাঁর গদ্যে লিখেছেন বিনোদিনী, আর ওই মাটিকে ছাপিয়ে তাঁর কবি দৃষ্টি হয়েছে আকাশবিহারী। উপেক্ষার ওপার থেকে বিনোদিনীর লেখালেখির যে ক'টি টুকরো আজ এসে পৌঁছেছে একালের পাঠকের হাতের নাগালে, তার মধ্যে আত্মস্মৃতির খণ্ড দুটি ছাড়াও রয়েছে তাঁর কবিতার সংকলন। রয়েছে 'বাসনা' নামে তাঁর একটি কবিতাপুস্তক, ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার এক দশক পরে প্রকাশিত বইটিতে ধরা আছে বিনোদিনীর একচল্লিশটি কবিতা, কবিতার এ বই তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর জননীকে। আর রয়েছে ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কনক ও নলিনী' নামে একটি ছোটো কাহিনিকাব্য, 'স্বর্গগতা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলা দাসীর উদ্দেশে' অর্পিত ক্ষুদ্র একটি 'কাব্যোপন্যাস'।

'কনক ও নলিনী'র এই কাহিনিকাব্যটি শুরু হয়েছে কনকের এই আহ্বানে,

নলিনীরে আয় ভাই দেখ আর বেলা নাই,
এতক্ষণ এসেছেন পিতা যে কুটিরে।
যপমালা কুশাসন, আহ্নিকের আয়োজন
করি নাই, দেখ ব'ন রবি বৃক্ষ শিরে।।
শুষ্কপত্র জড় করে রাখিয়াছি শয্যাতরে,
বাতাসেতে উড়ে বুঝি গিয়েছে সকল।
গেল বেলা একেবারে চল ব'ন যাই ঘরে,
সারাদিন নদীতীরে বেড়াবে কেবল?

'বাসনা' নামে কবিতাপুস্তকটির কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে গীতিকবি বিনোদিনীর পরিচয়, 'কে বা গায়' নামে তাঁর একটি কবিতার এই একটিমাত্র অংশেও হয়তো কিছুটা আভাস মেলে তার,

... বিষাদেতে মাখা ওই সঙ্গীত সুন্দর
দিগন্ত ব্যাপিয়া যায়, যেন সে জানাতে চায়
প্রত্যেক লহরী তার অশ্রুবারিময়
সমীরণে ডাকি যেন দুঃখকথা কয়।।
প্রফুল্লতা যেন কভু ছিল সেই স্বরে
আজি সে উৎসাহ নাই, হৃদয় হয়েছে ছাই;
প্রতিবর্ণ প্রতিছত্র আবরণ করে
শীতের শিশির মাঝে যেন ডুবে মরে।।...

৪. টিনের তলোয়ার

দেশকে এক নবীন মঞ্চ উপহার দিয়ে একাকী অসময়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বিনোদিনী, তবু কেন জানি না কেবলই মনে হতে থাকে আজকের পাঠকের, তাঁর মঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার ঠিক এক দশক আগে, ১৮৭৬ সালে, বাংলা নাটকের টিনের তলোয়ারকে ভয় পেয়েছিল ব্রিটিশ সরকার, জারি করেছিল নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল, বাংলা নাট্যশালার স্বাধীন স্বরখানি রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিল অর্ডিনান্সের আড়ালে, বাংলা নাটকের টিনের তলোয়ারের খোঁচায় সেদিন ছিঁড়ে গিয়েছিল তার দাপটের মুখোশ, তার ক্ষমতার চালচিত্র। বিনোদিনীও কি তেমনই এক তলোয়ারই ছিলেন সেদিন, যার এক এক খোঁচায় খসে পড়ছিল ভদ্রসমাজের অনেক ছদ্ম মুখের ভণ্ডামির, কৃত্রিমতার আবরণ? নইলে বিনোদিনীকে ঘিরে কেন এত অস্বস্তি তাঁদের, কেন বিনোদিনীর অকপট আত্মকথার ভূমিকা লিখতে বসে গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করেন, আত্মজীবনী রচনার কৌশল জানেন না তিনি! আলোর অধিকার ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েও, মুখর কণ্ঠকে নীরব করে দিয়েও বোধহয় নির্বাক করে দেওয়া যায়নি বিনোদিনীকে, নিঃশব্দ উপস্থিতিতে একটা অস্বস্তির কারণ হয়ে রয়েই গেছেন তিনি, টিনের তলোয়ার নয়, রয়ে গেছেন এক শাণিত ইস্পাতের তলোয়ার হয়ে, যাঁর যাপনকে লাঞ্ছিত করা চলে হয়তো, সততাকে বঞ্চিত করা চলে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কিন্তু তবু উপেক্ষা করা চলে না তাঁকে, নীরবতার হাজার রাজনীতিতেও মুছে দেওয়া যায় না তাঁর দেড়শো বছরের ধুলোয় ঢাকা মুখ।

সুরের সাধনায় দ্বিজেন্দ্রলাল

অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভিন্ন মনীষীদের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। তাঁরা কেউ সাহিত্য জগতে, কেউ অধ্যাত্মজগতে, কেউ সংগীত জগতে এমনকী যন্ত্রসংগীত জগতেরও অবিসংবাদী পুরুষ। এমনই একজন মানুষ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার গীতিকার কবি দেশপ্রেমিক। আমার জ্ঞান সীমিত তাই আমি আলোচনা করব শুধু তাঁর সংগীত সাধনার কথা-সুরের মূর্চ্ছনায় ও অপূর্ব লেখনীর সমন্বয়ে যা সকলের স্মরণ-পথে আজও ভেসে ওঠে।

অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি সংগীতের রসাস্বাদন করেন পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে। শোনা যায় তিনি যখন চার-পাঁচ বছরের, তখন তাঁর পিতা একদিন একটি হিন্দুস্থানি খেয়াল গাইছিলেন। বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মন দিয়ে বসে শুনছিলেন। হঠাৎ কার্যোপলক্ষে কার্তিকেয়চন্দ্র রায়কে উঠে যেতে হয়। ফিরে এসে দেখেন পুত্র হারমোনিয়াম নিয়ে ঐ হিন্দুস্থানি গানটির সুর বের করার চেষ্টা করছেন। তিনি পুত্রকে অনুমতি দিলেন এই সুরটি বাজানোর। চেষ্টা করতে করতে পুত্র কোনোরকমে ঐ সুরটি বাজাতে পারলে কার্তিকেয়চন্দ্র অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত হন। আবার যখন তাঁর বয়স হয় বছর বারো তখন একদিন তাঁর বড়ো ভাই জ্ঞানেন্দ্রলাল ছোটো ভাইকে বলেন নক্ষত্র বিষয়ে একটা গান রচনা করে গেয়ে শোনাতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল একটি কবিতা রচনা করে তাতে সুর দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রলালকে শুনিয়ে অবাক করে দেন।

গভীর নিশীথকালে নিরজনে আসিয়া,
কে তোমরা প্রতি নিশি রহ নভ শোভিয়া,
তপন নির্ব্বাণ হলে, ভাসিয়া গগনতলে,
নিশীথ আঁধারে সব শোভা রাশি ঢালিয়া?
কাঁদরে আঁধারে বসি, কেন নিরজনে আসি,
প্রভাত না হতে নিশি কোথা যাও চলিয়া?
আঁধারে ও শোভা রাশি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই যাই প্রতি নিশি তব সনে কাঁদিয়া।
তোমার নায়নোপরে, বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে,
অবারিত চোখে মোর যায় অশ্রু ভাসিয়া।

ছোটো থেকে গীত রচনার দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গান রচনা করে তিনি দেবীকে উপহার দিতেন। তিনি অসাধারণ শ্রুতিধর ও স্মৃতিসম্পন্ন ছিলেন। একবার অতি শৈশবে একটি নাটক দেখে এসে সেগুলো নিজে নিজে পুনরাবৃত্তি করলে আড়াল থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয় তা দেখতে পান। খুব

খুশি হয়ে তিনি কার্তিকেয়চন্দ্র রায়কে বলেন তাঁর ছেলে একদিন অনেক বড়ো হবে। অভিনয় ও সংগীত তাঁর জীবনে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে ছিল। সুর ও গান — দুটি বিষয়েই তিনি দিলেন সব্যসাচী। তাঁর ছিল গভীর আত্মপ্রত্যয়। একবার পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল ও পুত্র দিলীপকুমারের মধ্যে তর্ক হয় ওস্তাদি গান নিয়ে। বিখ্যাত খেয়াল-গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্বন্ধে দিলীপকুমার রায়কে তিনি বলেন — 'তিনি যত বড়ো গাইয়েই হোন না কেন, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁকে লোকে ভুলে যাবে?' উত্তরে দিলীপকুমার বলেন 'সে তো সবাইকেই যাবে।' দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেন না — তাঁকে বা রবিবাবুকে কেউ ভুলে যাবে না কারণ — 'আমরা রেখে যাব বাঙালির প্রাণের জিনিস — সুরে বাঁধা গান। আমি যে কী সব গান বেঁধে গেলাম, সেদিন তুইও বুঝবিই বুঝবি।' কথাটা সম্পূর্ণ সত্য তাই তো মনে হয়। 'ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা' গানটি শুনলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনেও কি তাঁর নামটি মনে পড়বে না?

খুব ছোটো বয়স থেকেই তাঁর মনে বিদেশি-বিদ্বেষ জেগে ওঠে। যদিও তিনি বিদেশে গিয়েছেন, সেখানকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, তাদের গানের সুরে অনুপ্রাণিত হয়ে নাটকের ভাবধারা গ্রহণ করে নিজের নাটকে তার প্রয়োগ করেছেন। তবুও এটা অনস্বীকার্য যে মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন স্বদেশি। জানা যায় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পাহাড়' গানটি শুনে বলেন — 'আপনার এই গানে আমরা কবির কবিত্ব উপভোগ করি মাত্র। কিন্তু আমি যদি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাঙ্গালার বিষয় ও ঘটনা থাকে।' এই কথা শোনার পরেই তিনি 'আমার দেশ' গানটি রচনা করেন। গানটি রচনাকালীন একটি সুন্দর ঘটনা জানা যায় যেখানে তাঁর প্রিয় বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অষ্টমী পূজা-আহারান্তে দেবকুমার ও পুত্র দিলীপকুমার বসে আছেন গয়ার বাড়িতে। হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল বলে উঠলেন বন্ধুকে উদ্দেশ করে — 'দেখো মাথার মধ্যে কয়েকটা লাইন জ্বালাতন করছে, তুমি একটু বোসো ভাই, আমি সেগুলি বেঁধে নিয়ে আসি।'

একটু পরে এসে বললেন — 'উঃ! কী চমৎকার গান বেঁধেছি। শোনো।' — বলেই গেয়ে উঠলেন — 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ' — হাততালি দিয়ে ঘরময় নেচে নেচে গাইতে লাগলেন — 'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।' পুত্র দিলীপকুমার ও কন্যা মায়াদেবী (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধু) পিতার সঙ্গে গাইতে থাকেন। গানটির শেষ চরণে ছিল 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ।' — বন্ধু দেবকুমার চৌধুরী, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, বরদাচরণ মিত্র — তিনজনই ঐ শেষ অংশটি পরিবর্তন করতে বললেন কারণ রাজরোষের অপরাধে ঐ অংশটি ছাপলে তাঁর চাকরি যেতে পারে। তার থেকে আরও বেশি শাস্তি পেতে পারেন। অবশেষে তাঁদের সকলের বারংবার অনুরোধে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তিনি লিখলেন — 'মানুষ আমরা নহিতো মেষ।' তবে একটি আশ্চর্য বিষয় ছিল গানটি বাঁধতে না বাঁধতে অপূর্ব সুর এসে যেত। এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। উদাত্ত কণ্ঠে অতুলনীয় সুরসংযোগে তিনি গানটি গেয়ে চললেন। তাঁর পুরুষালি কণ্ঠে যে কোনো গানই প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার বলেন বারাণসীতে ১৯২০ সালে তিনি 'নন্দলাল' কবিতাটি সুর সহযোগে গান করে শোনালে হলের বহু লোকই খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই গান শুনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারকে বলেন হল না — তার বাবা নিজে ঐ গান এমনভাবে পরিবেশন করতেন যে প্রত্যেকে লুটিয়ে লুটিয়ে হাসত। এর থেকেই বোঝা যায় তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন। তবে তাঁর রচনাগুলির প্রাণ ছিল প্রধানত গান এবং এই

গানগুলির মধ্যে দিয়েই ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনের পূর্ণ বিকাশ। ওস্তাদি গানের গোঁড়ামি তিনি পছন্দ করতেন না। বলতেন — 'বাঙালি হল স্বধর্মে ও স্বভাবে কবি ও স্রষ্টা, ভাবপ্রবণ — ওস্তাদিপ্রবণ নয়। তাই আমাদের কাছে নিছক ওস্তাদি পরধর্ম।' লঘুগুরু ছন্দে তিনি বহু গান রচনা করেন। সুর ও কাব্য — এই দুই কবচকুণ্ডল নিয়েই তিনি যেন জন্মেছিলেন। তাই কোনো সুর শুনলেই তাঁর মনে গান ভেসে উঠত। দিলীপকুমার একদিন গল্প করেন — ঝামাপুকুরে হেম মিত্রের বাড়িতে এক অন্ধ গায়ক ঝিঁঝিট খাম্বাজে 'তারিণী গো মা, কেন সিঙ্গির সাথে এত আড়ি? মানুষ মরলে টেরটা পাবে ছুটতে হত হরিণ বাড়ী।' (হরিণ বাড়ি অর্থাৎ জেলখানা) গানটি করেন। শোনা মাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিখ্যাত শ্যামাসংগীত — 'এবার তোরে চিনেছি মা / আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি। ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা পাঠিয়ে দিচ্ছি যমের বাড়ী।' — গানটি তৈরি করে ফেলেন। ঠিক সেইভাবে 'কানা শরৎ'-এর টপ্পা — 'ছি ছি নিঠুর কপট তুমি প্রাণসখা।' শুনেই দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়ে উঠলেন —'আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি / ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই।'

বিলেতে গিয়ে জার্মান, আইরিশ ও স্কচ ভাষায় গান গাইতে গাইতে ঠিক সেই সুরেই বাংলা গান গেয়ে উঠলেন একের পর এক, সবগুলি গানই অনেকের মতে রসোত্তীর্ণ না হলেও 'তাঁর মুখে কোনো কোনো গানের ও সুরের বাংলা প্রতিরূপ শুনে এত মজা লাগত আমাদের যে, মায়া ও আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাইতে গাইতে হেসে গড়িয়ে পড়তাম' — (দিলীপকুমারের উক্তি) Some Folks গানের তিনি তর্জমা করেছিলেন একই ছন্দে ও সুরে —

কেউ কেউ করে হায়
কেউ কেউ করে কেউ কেউ করে কেউ কেউ মরতে চায়
আমি তুমি তার কেউ নই
বেঁচে থাক সে হাসিখুশি প্রাণ সব হাসে যারা দিন রাত
যেন মজার বাদশা ... যে বলুক না খুশি যে রাত।

দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকাংশ বিদেশি গানের ভাষান্তর করেছেন মূল বজায় রেখে। যেমন — 'Ye banks and braes...' এই গানটির রূপান্তর স্বচ্ছন্দে করে তোলেন —

কেমনে তুই যে যমুনাপুলিন
সাজিস্ রে এত ফুল্ল ফুলগনে, ...

অনুবাদটি স্বচ্ছন্দে 'Ye banks ...' এর সুরেও গাওয়া চলে। এইভাবে নানা ভাষার গানকে ভেঙে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেখা 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' গানটির ভাবসংযোজনে ফুটে উঠেছে ব্রিটিশ স্বদেশগীতি সার্থক স্বদেশি সংগীতে।

ইংরেজ সমাজে আসর ভাঙার প্রাক্‌কালে সমস্ত নরনারী সুরাপাত্র নিয়ে গাইতেন —

We'll tak' a cup o' kindness yet
For auld lang syne.

এই প্রসিদ্ধ গানটি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই গানটির সুরে লিখলেন 'পুরানো সেই দিনের কথা ...' দ্বিজেন্দ্রলাল তারই পাশাপাশি গানটির যে রূপান্তর করলেন তা এইরকম

পুরান প্রেমকো নহি জাও ভঁইয়া হো,

পুরান প্রেমকো আওর যো দিন গিয়া হো ...

দেশওয়ালি হিন্দির এমন প্রয়োগ তাঁর সৃজনক্ষমতার অনন্য পরিচয়। এইভাবে দেখা যায় যিনি বিলাতি ভাবধারায়, বিলাতি গানে ও সংস্কৃতিতে ষোলো আনা সাহেব হয়ে দেশে ফিরে আসেন ও সেই মানুষই পরবর্তীকালে খালি গায়ে খালি পায়ে গেয়ে ওঠেন —

পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে

বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।।

বরিস শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে।

মা ভাগীরথি! জ্ঞাহ্নবি! সুরধুনি! কলোকল্লোলিনি গঙ্গে।।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশি সংগীত রচনার প্রথম অধ্যায়ে ছিল শুধু কান্না দেশের দুর্দশায় — 'কেন মা তোমারি / সহাস বদন আজ মলিন নেহারি' পরবর্তীকালে সেই লেখনীই জ্বলে ওঠে দেশভক্ত বীরদের উদ্দেশে — 'জ্বালাও ভারত হৃদে উৎসাহ অনল / ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।'

মাত্র উনিশ বছর বয়সে লিখলেন — 'ছিল এ ভারত বসুধা উদ্যান / জগতের তীর্থ পুণ্যময় স্থান '। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে বসে বলে উঠলেন — 'O my land ! Can I cease to adore then?' — দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের জন্য আবাল্য তিনি বিশ্বাস করতেন সুপ্ত বীর্যের পুনরুজ্জীবনে। তাই উনিশ বছর বয়সেই গেয়েছিলেন —

এখনো আমরা সেই আর্যের সন্তান হে,

বহিছে শিরায় আর্য শোণিত প্রবল,

সেই বেদ-সে-পুরাণ আজো বর্তমান হে,

সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল।।

স্বামীজি যেখানে বলতেন 'আত্মবিশ্বাসেই মুক্তি', দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সত্যকে উপলব্ধি করে দেশবাসীর উদ্দেশে সুর-সংযোগে গেয়ে উঠলেন — 'আবার তোরা মানুষ হ।' বিদেশি সুর সাধনায় দেখা যায় Movement অর্থাৎ গতিশক্তির প্রয়োগ। ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে সুরগুলি চলার প্রবণতা। কিন্তু ভারতীয় রাগসংগীতে শোনা যায় ধীরগতির স্বরবিন্যাস। দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশি চলনটাই ভালোবাসতেন কারণ তার মধ্যে তিনি প্রাণশক্তির চমক পেতেন। তাই তো 'আমার জন্মভূমি'-তে শুনতে পাই প্রথমবার মুদারার 'মা' থেকে ছ-টা সুর ডিঙিয়ে তারার 'গা'-তে স্বরসংযোগ আবার পরের অংশে সেখান থেকে চলে এল মুদারার-'রে'-তে। এইভাবেই সুরের গতিশীলতার মধ্যে দিয়ে তাঁর অভিনবত্ব ফুটে ওঠে অথচ একবারও মনে হয় না শ্রুতিকটু। যদিও এটা মনে

রাখতে হবে সমস্ত গানের ক্ষেত্রেই তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। তবে 'হাসির গান'-ই যে তাঁর অক্ষয় কীর্তি— এটি অনস্বীকার্য। তাঁর হাসির গানের মধ্যেই প্রকাশ পায় তাঁর দেশাত্মবোধের প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে লিখেছিলেন — 'দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যে যে অপূর্বরস — বঙ্গভাষায় যে একটু নতুন প্রাণ আনিয়া দিয়াছেন — তাঁহার কাব্যের মধ্যে যে পৌরুষ এবং তাহার হাস্যের অভ্যন্তরে যে তেজ প্রকাশ পাইয়াছে — বিদ্রুপের চাপল্যের মধ্যেও সুগভীর সত্যকে রক্ষা করিয়া তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, তাহার আনন্দ আমি প্রথম হইতেই, যখন তিনি সাহিত্য সংসারে অপরিচিত ছিলেন, তখন হইতেই অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি।' দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে অপূর্ব কৌতুকপূর্ণ নির্মল সজীবতাময় গান আর কারুর মধ্যেই শোনা যায়নি। হাসির গানের মধ্যে দিয়েই তিনি স্বদেশ ও বিদেশ উভয় সমাজের প্রতিই বিদ্রুপ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তৎকালীন ভারতীয় যুবক সম্প্রদায়ের অনেকেই বিদেশিদের অনুকরণে জীবন কাটাতে উৎসাহী ছিলেন। তাদের উদ্দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী গর্জে উঠল। গেয়ে উঠলেন —

আমরা বিলেত ফের্তা ক'ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই
তা কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে
সেজেছি বিলিতি বাঁদর;
আমরা বিলিতি ধরনে হাসি
আমরা ফরাসি ধরনে কাশি
আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

স্বার্থমগ্ন দেশপ্রেমিকদের ব্যঙ্গ করে গাইলেন —

রাজা! দেখ, হতে পারতাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির।

তিনি কোনোদিন ইংরাজ প্রশাসন মেনে নেননি তাই বারবার তাঁর কর্মস্থল পরিবর্তিত হয়। বিদ্রুপ করে বলেছেন তাঁকে বারবার হয়রান করলেই কি তিনি তাঁর মত ও বিশ্বাসকে পাল্টাবেন? ইংরাজদের হিন্দুয়ানির ভেক ধারণ করতে দেখে গাইলেন — 'হোলো কি? এ হোলো কি? — / এত ভারি আশ্চয়ি! ...'

জাতীয় জীবনের অধোগতির দৃশ্যে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। তাই তাকে গোপন করতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন হাসির ব্যঙ্গের ও বিদ্রুপের গানে। তবে এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, তিনি ভারতীয় আত্মিক

শক্তির সঙ্গে ইউরোপীয় প্রাণশক্তির সমাহারে যে সুরের সৃষ্টি করেন তা ছিল অসাধারণ। প্রতিটি সুর-সংযোজনে আছে নূতনত্ব, আছে প্রাণোচ্ছলতা, আছে ওজস্। এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু তাঁর মধ্যে ভক্তিরস পূর্ণ মাত্রায় ছিল। কৃষ্ণ-শিব-শক্তি এই তিনটি মূল ধারাতেই তিনি সাড়া দিতেন। শিবের নামোচ্চারণে তিনি লিখলেন — 'ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী ...'। শ্যামাসংগীতের ভক্তি ভাব ফুটে ওঠে যখন শোনা যায় 'একবার গালভরা মা ডাকে ...'

'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে ...' শুনে শ্রীমদনমোহন মালব্য দিলীপকুমারকে বলেন — শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তোস্ত্র 'দেবী সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে! ...' পরে 'এমন উদার মধুর প্রাণছাড়া গঙ্গাস্তব আর কেউ লেখেনি আজ পর্যন্ত — প্রত্যেক হিন্দুর এটা গাওয়া চাই।'

এইভাবে সুরের জাল বুনে একের পর এক তিনি তন্ময় হয়ে গাইতেন — 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো ...' বা 'সাঙ্গ ইল ধূলাখেলা, হয়ে এল সন্ধ্যাবেলা ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, শেষে তোমায় হারাই পাছে।' মনে হয় আরও কিছুদিন যদি তিনি ইহলোকে থাকতেন তাহলে সংগীত জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয় আরও কিছু পেত কিন্তু তার আগেই যে তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠল সেই সুর —

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে

কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে 'আয় চলে আয়,

ওরে আয় চ'লে আয় আমার পাশে।' ...

গ্রন্থঋণ — দ্বিজেন্দ্র-গীতি — শ্রী দিলীপকুমার রায় - সুরসুধাকর

দ্বিজেন্দ্রলাল - উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ- সম্পাদনা - মোহিত রায়

সার্ধশতবর্ষের আলোকে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

মধুমিতা ভট্টাচার্য

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, যিনি বাবা আলাউদ্দিন খাঁ নামেও পরিচিত ছিলেন। মূলত সরোদিয়া হিসেবে বহুল পরিচিত হলেও বস্তুতপক্ষে তিনি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সুরস্রষ্টা এবং বিংশ শতাব্দীর অন্যতম এক সংগীতশিক্ষাচার্য।

বর্তমান বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে ১৮৮১ সালে আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম হয়। পিতা সব্দর হোসেন খাঁ-র (সাধুখাঁ) তৃতীয় পুত্র ছিলেন তিনি। সাধু খাঁ-র দ্বিতীয় পুত্র ফকির আফ্তাবউদ্দিন ছিলেন একজন সিদ্ধ সংগীতসাধক। তিনিই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে আলাউদ্দিনের প্রথম সংগীতশিক্ষাগুরু। যাঁর কাছে সংগীতশিক্ষার হাতেখড়ি হয় তাঁর। সাধু খাঁ নিজেও ছিলেন একজন সেতারী, শোনা যায় যে তিনি কিছুদিন কাশিম আলীর কাছে তালিমও নিয়েছিলেন। শিশু আলমের পাঠে মন ছিল না। কারণ সংগীতে ছিল তাঁর জন্মগত আকর্ষণ। তাই প্রতিদিনই পাঠশালা থেকে পালিয়ে একজন সাধু সেতারীর সঙ্গে তবলা সংগত করে বাড়ি ফিরতেন। সুতরাং বেদম প্রহার এবং উপবাসী থাকার শাস্তি প্রায়ই ভোগ করতে হত। কিন্তু, সুরতৃষ্ণা তাতেও নিবৃত্ত হত না। মাত্র আট বছর বয়সে একবুক সুর-পিপাসা নিয়ে বালক আলাউদ্দিন সুরলোকের সন্ধানে গৃহত্যাগ করলেন।

গৃহত্যাগের পর বালক আলাউদ্দিন প্রথম আশ্রয় পান পার্শ্ববর্তী গ্রামে এক ভবঘুরে যাত্রাদলে। তাদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে যান ঢাকা শহরে। এই সময় তিনি বাংলা সঙ্গীতের লোকধারার সঙ্গে পরিচিত হন। দীর্ঘ সাত বছর পরে আলম চলে যান কলকাতায়। সাময়িকভাবে নাম পরিবর্তন করে মনোমোহন দে নামে তৎকালীন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর (নুলো চক্রবর্তী নামে যিনি বেশি পরিচিত) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীচক্রবর্তী ছিলেন ধ্রুপদ, খেয়াল এবং টপ্পা গানে সিদ্ধ। সাত বছর তালিম নেবার পর গুরুর মৃত্যুতে আলমের সংগীত শিক্ষায় সাময়িক ছেদ পড়ে। ইতিমধ্যে আলমের সন্ধান পেয়ে আত্মীয়রা তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং নয় বছরের কন্যা মদনমঞ্জরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিন্তু, সুরপিয়াসিকে বিবাহবন্ধনে বাঁধা গেল না। বিবাহরাত্রেই তিনি আবার নিরুদ্দেশ হলেন।

এই সময় তিনি প্রসন্নকুমার বিশ্বাস নাম নিয়ে মাসিক বারো টাকা মাইনেতে মিনার্ভা থিয়েটারে তবলিয়ার কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর সংগীত শিক্ষা থেমে থাকে না। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অমৃতলাল দত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ক্ল্যারিওনেট এবং পাশ্চাত্য সংগীতের শিক্ষাগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি গোয়ার ব্যান্ডমাস্টার লোবো সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য রীতিতে বেহালা এবং অমর দাশের কাছে ভারতীয় রীতিতে বেহালা বাদন শেখেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন রকম যন্ত্র-বাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন।

মুক্তাগাছার জমিদার জগৎ কিশোর আচার্য-র দরবারে আসগর আলি খানের (আমজাদ আলি খানের পিতৃব্যপিতামহ) শিষ্য আহমেদ আলি খানের সরোদবাদন শুনে আলাউদ্দিন সরোদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং

তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সরোদশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। পাঁচ বছর আহমেদ আলি খানের কাছে সরোদ শিক্ষার পর তিনি বহু কষ্টে রামপুরের নবাবের সহায়তায় তানসেন বংশীয় বীণকার উজীর খাঁর কাছে সংগীত শিক্ষার সুযোগ পান। নিজের অধ্যবসায়, গুরুভক্তি, নিষ্ঠা দিয়ে গুরুর প্রসাদধন্য আলাউদ্দিন পরিচিত হন সেনিয়া ঘরানার (তানসেন ঘরানা) সাথে। উজীর খাঁ-ই ছিলেন তাঁর প্রধান শিক্ষাগুরু। শিক্ষাশেষে পরিণত শিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ মাইহার রাজ্যের মহারাজা ব্রিজনাথ সিংহের রাজদরবারে সংগীতশিল্পী নিযুক্ত হন। এইসময় তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের মাইহার ঘরানার পুনর্জীবন দান করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইহার ঘরানার উৎপত্তি হলেও আলাউদ্দিনের অশেষ অবদানের জন্য অনেকেই তাঁকে মাইহার ঘরানার জনক পুরুষ বলে মনে করেন। এইসময় থেকেই তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় যন্ত্রসংগীতে বীণ এবং ধ্রুপদ আঙ্গিক ব্যবহার করে তার অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটান। তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য 'অর্কেস্ট্রা'র সম্মিলনে তৈরি করেন বৃন্দগান — 'মাইহার ব্যান্ড'। এটি তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

বহু আয়াসে যে সংগীতের দেবী তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিলেন, সেই দেবীর পদতলে বসে তিনি অকৃপণভাবে বিতরণ করেছেন তাঁর শিক্ষা এবং এইভাবে তৈরি করেছেন তাঁর অগণিত উত্তরসূরী। পুত্র এবং অন্যতম শিষ্য আলি আকবর খাঁকে আলাউদ্দিন শিখিয়েছিলেন সরোদ। কন্যা অন্নপূর্ণা শিখেছিলেন সুরবাহার ও সেতার। পুত্রসম শিষ্য রবিশঙ্কর, নিখিল ব্যানার্জি তাঁর কাছে শিক্ষা করেছিলেন সেতারবাদন; রবিন ঘোষ বেহালা এবং বৈজনাথ সিং ও পান্নালাল ঘোষ শিখেছিলেন বাঁশের বাঁশি (বাঁশরি)। ১৯৩৫ সালে তিনি উদয়শঙ্কর ব্যালে ট্রুপের সঙ্গে ইওরোপ ভ্রমণে যান এবং মুগ্ধ করেন অগণিত পাশ্চাত্য সংগীতরসিকচিত্তকে।

আলাউদ্দিন খাঁ ১৯৫২ সালে সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৫৮ সালে পদ্মভূষণ এবং ১৯৭১ সালে পদ্মবিভূষণে ভূষিত হন।

তিনি মিশ্ররাগ খুব পছন্দ করতেন। তাই তিনি অনেক নতুন রাগ সৃষ্টি করেন। সে-রকম কিছু কিছু রাগ হল — অর্জুন, ভীম, ভুবনেশ্বরী, চন্ডিকা, ধ্যানকোশ, হেমন্ত, হেম-বেহাগ, হেমন্ত-ভৈরব, জৌনপুরী-টোড়ি, কোমল ভীমপলশ্রী, মদনমঞ্জরী, মাঝ-খাম্বাজ, নট-খাম্বাজ ইত্যাদি। সংগীত সমালোচক মোহন নাদকার্নি Illustrated Weekly of India - র নভেম্বর ১৯৮০ সংখ্যায় লেখেন : "Ustad Allauddin Khan was 110 when he passed into history in 1972. He was something more than a musical geneious, a visionary whose like is born but once in centuries. Few luminaries have shone so resplendently on the musical firnament for over half a century as the venerable maestro. Fewer still are those who could achieve, with such tremendous success, the unique synthesis of tradition & experiment in the realm of Hindustani instrumental music.

Of historic significance was the new trail he blazed in the field of veena-based fusion of gayaki, layakari and tantrakari and its adoption to the playing instruments like the sitar, sarod and several others. And he himself showed how this approach made it possible for our raags and raaginis to emerge in their true form, dignity, grandeur, colour and sparkle."

শতবর্ষে স্মরণে বিস্মরণে সাদাত হাসান মান্টো

ছবি কুণ্ডু (১৯৭৫)

উর্দু সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫) স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও বিতর্কিত লেখক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। জন্মের শতবর্ষ পরেও তিনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। অন্তরঙ্গ জগৎ এবং জীবন-দর্শন হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির জালে এক অভিনব এবং বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে তাঁর সাহিত্যে। কথাশিল্পের শৈল্পিক-নান্দনিক রূপ নেই তাতে, যা আছে তা হল সামাজিক মানুষ অথবা মানুষের সমাজ যা সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছ আলোয় জীবনদীপ্ত।

পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সমরালা গ্রামে এক কাশ্মীরি মুসলিম পরিবারে মান্টোর জন্ম। কঠোর হৃদয় পিতা এবং কোমলপ্রাণা মাতার সংসারে নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রাখতে চাইতেন, ভালোবাসতেন বই পড়তে। কিন্তু স্কুলের পড়াশোনায় মনোযোগ ছিল না। তারপর যখন নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলেন তখন ইন্টার পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু দু-দু-বার পাশ করতে পারলেন না — উর্দু সাহিত্যের সেরা লেখক অকৃতকার্য হয়েছিলেন উর্দু পরীক্ষাতেই। তৃতীয়বারের চেষ্টায় পাশ করে ১৯৩১ সালে ভর্তি হলেন অমৃতসরের হিন্দুসভা কলেজে। এই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি।

তাঁর সাত বছর বয়সে ঘটে যাওয়া জালিয়ানওয়ালাবাগের নিদারুণ ট্রাজেডি নিয়ে লিখেছেন তাঁর প্রথম গল্প 'তামাশা'। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর উর্দুতে লেখা প্রথম ছোটোগল্পের সংকলন Atish Pare (Sparks; also quarrel provokers) প্রকাশিত হয়। জীবিকানির্বাহের জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদনার কাজে যোগ দেন। মুম্বাইতে বসবাসকালে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শুরু করেন রেডিও-নাটক রচনা ও ফিল্মের চিত্রনাট্য রচনা। চলতে থাকে গল্প লেখার কাজও। সেইসব গল্পের চরিত্ররা উঠে এসেছে তাঁর সাংবাদিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। মানুষের সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা-নিপীড়ন, জীঘাংসা-ক্রুরতা, অমানবিক হানাহানি রক্তক্ষয় মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক সমাজের অনুশাসন ও রীতিনীতিকে তিনি অনায়াসে অতিক্রম করেছেন স্বচ্ছ যুক্তিবোধের আলোয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতার কন্টকস্বরূপ দেশবিভাগ, ফলস্বরূপ শতশত মানুষের ছিন্নমূল অসহায় পরিণতি লেখক-সাংবাদিক মান্টোর লেখায় তথ্য ও সত্যের সমাবেশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের এই অসমীচীন বন্টননীতির বিরুদ্ধে তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত দেশনেতাদের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী প্রতিবাদে ঝলসে উঠেছে। কখনো বা বিদ্রুপ-ব্যঙ্গের কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। মান্টো নিজেও ১৯৪৫ সালে স্ত্রী সফিয়া ও তিন কন্যাকে নিয়ে মুম্বাই ত্যাগ করে লাহোরে চলে যান অব্যক্ত অভিমান নিয়ে, স্ব-ধর্মের মানুষের মধ্যে বসবাস করতে।

কিন্তু যে আশা নিয়ে নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে এলেন তাও পূর্ণ হল না। সেখানেও তিনি সমাদর পেলেন না। একটি প্রিন্টিং প্রেসের জন্য পারমিট চেয়েছিলেন তিনি, কর্তৃপক্ষ তাকে পারমিট দিলেন প্রিন্টিং প্রেসের নয় আইস ফ্যাক্টরির। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রচলিত বিশ্বাস ও অন্ধ কুসংস্কারের তীব্র সমালোচক মান্টো (বরফ-বিক্রেতা হোক। অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মান্টো) আপসহীন মনোভাব নিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি। ১৯৫৫ সালে ১৮ জানুয়ারি তেতাল্লিশ বছর পূর্ণ হবার কয়েক মাস আগেই তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর রচনাসম্ভার সমৃদ্ধ হয়েছে ২২টি ছোটোগল্পের সংকলন, একটি উপন্যাস, ৫টি বেতার নাটক, তিনটি প্রবন্ধ সংকলন, দুটি আত্মজীবনীমূলক রচনা এবং অসংখ্য ফিল্মের চিত্রনাট্য দিয়ে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'তোবাতেক সিং', 'খোল দো', 'ঠান্ডা গোশ্‌ত', 'বাবু গোপীনাথ', যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে পাকিস্তান এবং ভারত দুটি রাষ্ট্রেরই পাঠক-সমাজে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিতও হয়েছে তাঁর সাহিত্য।

মান্টো কখনো সমাজের প্রশংসা পাননি। তাঁর পক্ষে যত কথা বলা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বলা হয়েছে তাঁর বিপক্ষে। তাঁর লেখার জন্য তাঁকে অন্তত ছ-বার কোর্টে অভিযুক্ত করা হয়েছে — স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে তিনবার এবং স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানে তিনবার। কিন্তু কোনোবারই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি। আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর বক্তব্য ছিল 'A writer picks up his pen only when his sensibility is hurt.' '... If you find my stories dirty, the society you are living in is dirty. With my stories I only expose the truth.' তিনি জানতেন আজ যারা তাঁর লেখা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করছে, তারাই একদিন তাঁর প্রশংসা করবে। পাকিস্তানের বিখ্যাত নাট্যকার শাহিদ নাদিম বলেন, 'The conservative forces really hounded him, and the progressive forces failed to protect him.'

তবে তাঁর লেখার মাধ্যমে তিনি যে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেরই হৃদয় ছুঁয়ে গেছেন তা বলাই বাহুল্য। দেশবিভাগজনিত অমানবিক দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তার সমবেদনা পেয়েছে। বলেছেন — দাঙ্গায় এক লক্ষ হিন্দু মারা যায়নি, মারা যায়নি এক লক্ষ মুসলমান, মারা গেছে দুই লক্ষ মানুষ। লিখেছেন, 'Hindustan had become free, Pakistan had become indepent soon after its inception but man was still slave in both these countries – slave of prejudice – slave of religious fantacism – slave of barbarity and inhumanity.'

এই বছর (২০১২) ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করছে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। ভারতে অক্টোবর মাসের ২৯-৩১ তিনদিন ব্যাপী দিল্লির আম্বেদকার ইউনিভার্সিটির কাশ্মীরি গেট ক্যাম্পাসে 'Manto-Age' শীর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লেখক-সাংবাদিক-চিত্রনাট্যকার-সমালোচক মান্টোর এই বহুমুখী প্রতিভাকে তুলে ধরার জন্য ছিল আলোচনা-সভা ছাড়াও বিভিন্ন নাট্যসংস্থার দ্বারা অভিনীত মান্টোর 'মান্টো কে কলম সে', 'দফা ২৯২', 'এক মুলাকাত মান্টো সে'। পাঠ করা হয় মান্টোর বিখ্যাত গল্প 'তোবা তেক সিং', 'খোল দো' এবং 'এক এক কাৎরে কা মুঝে দেনা পড়া হিসাব' — যা উপস্থিত দর্শকদের বিস্ময়-বিষাদে হতবাক করে দেয়। জানা যায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে তিনি ভালোবাসতেন। পছন্দ করতেন দীপাবলির আতসবাজি এবং ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব।

পাকিস্তানেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মান্টোকে শতবর্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। আলোচিত হয় পঞ্চাশ দশকের কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর সাহিত্যের সূচনা। বহু পুরস্কারে সম্মানিত নাট্যকার শাহিদ নাদিম এবং সরমদ খুজত 'ম্যায় মান্টো' নামে একটি টিভি সিরিয়াল তৈরি করেন, যার মাধ্যমে মান্টোর সাহিত্যকে দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে চান। নাদিম বলেন, 'Manto could forsee what would happen, he told the truth.'

মান্টোর সাহিত্যের মূল্যায়ন তাঁর স্মৃতিচারণা থেকেই পাওয়া যাবে। বলেছেন — মান্টো নিরক্ষর কারণ সে মার্কস পড়েনি, ফ্রয়েডও নয়। হেগেলের নামটুকু মাত্র জানে। তবু আলোচকরা মনে করে তার লেখায় নাকি এদের প্রভাব আছে। কারো মতবাদে প্রভাবিত হবে মান্টো সে বান্দাই নয়। তাঁর ধারণায় তিনি সাহিত্যের দরবারে পাপোশ মাত্র। নিজেকে আছড়িয়ে পিটিয়ে গ্লানিমুক্ত করতে যার অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। নিজস্ব ভঙ্গিতেই রচনা করেছেন 'এপিটাফ' যা তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়নে হতে পারে শেষ কথা। 'In the name of God, the Compassionate, the Merciful here lies Sadat Hasan Manto and with him lie buried all the secrets and mysteries of the art of short-story writing. ...

Under tons of earth he lies, still wondering who among the two is greater short story writer : God or he.'

তোবা তেক সিং

সাদাত হাসান মান্টো
অনুবাদ : টুপুর চক্রবর্তী (১৯৯৭)

দেশভাগের বছর দুই-তিন পরের কথা। হঠাৎ ভারত এবং পাকিস্তান, উভয় দেশের সরকারের-ই মনে হল, জেলের কয়েদিদের মতো পাগলাগারদে বন্দী যারা, তাদেরও হস্তান্তর করা প্রয়োজন। তবে কোনটা কার দেশ, তা নির্ধারিত হবে কেমন করে? কেন, আর পাঁচটা ভারতীয় আর পাকিস্তানির যেমন করে হয়! ধর্মের ভিত্তিতে! ভারতের মুসলিম পাগলরা আসবে পাকিস্তান-এ আর পাকিস্তান-এর সব হিন্দু ও শিখ পাগল যাবে ভারতে। সহজ সমাধান।

অর্থ-অনর্থ পরের কথা। তবে অতি বড়ো নিন্দুকেও মানবে, হাজার দফা আলোচনা ছাড়া এ-হেন যৌথ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব ছিল না — কবে, কোথায়, কীভাবে ইত্যাদির আলোচনা—নাতিদীর্ঘ থেকে অতিদীর্ঘ। ঠিক হল, ভারতের যে-সব মুসলিম পাগলের পরিবার-পরিজন ও-দেশেই থাকে, তাদের আর পাকিস্তানে পাঠানোর দরকার নেই। তবে পাকিস্তানের পরিস্থিতি অবশ্য ভিন্ন: যে-হেতু সেখানকার হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া সব হিন্দু আর শিখই ভারতে চলে গেছে, কাজেই অ-মুসলিম উন্মাদদের পাকিস্তানে রাখার প্রশ্নই ওঠে না।

ভারতের কথা সে-ভাবে জানা নেই, তবে এই অদলবদলের খবরে পাকিস্তানি পাগলদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এক মুসলিম উন্মাদ, 'জমিদার' নামে এক জ্বালাময়ী পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক, তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, 'পাকিস্তান কী?' সে খুব ভেবেচিন্তে উত্তর দিল,'ওই তো ভারতের একটা জায়গা, চমকিলা ক্ষুর বানায়।' এই পর্যবেক্ষণে কারও আপত্তি আছে বলে মনে হল না।

আরেকদিন, দুই শিখ-এর গুরুগম্ভীর আলোচনা চলছে। একজন বলল, 'সর্দারজি, ভারতে পাঠাচ্ছে কেন? আমরা তো ও-দেশের ভাষাই জানি না!' অন্যজন মুচকি হেসে বলল, 'ওই হিন্দুস্তানিদের ভাষা আমি খুব জানি। হাবভাব দেখলে মনে হয় এই দীনদুনিয়া ওদের বাপের জমিদারি!'

তবে, পাকিস্তানের সব কয়েদি যে পাগল ছিল, তা নয়। কয়েকজনের জ্ঞানের নাড়ি ছিল টনটনে। তারা সব খুনে-ডাকাত। যাতে ফাঁসিতে ঝুলতে না হয়, তাই পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের হাত করে বাড়ির লোকেরা তাদের পাগলাগারদে পাঠিয়েছে। ভারত ভাগের ব্যাপারে তাদের হয়তো অল্প কিছু জানা ছিল, পাকিস্তান যে কী তাও জানত; কিন্তু ঠিক কী যে ঘটতে চলেছে তার আগামাথা তারাও বুঝতে পারছিল না।

খবরের কাগজে তো তেমন কিছুই লেখে না; আর গো-মুখ্যু পাহারাদারগুলোকে জিজ্ঞাসা করা না করা সমান। তবুও খবর যেমন ভেসে বেড়ায় আর কি! কে না কে এক মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, সে নাকি মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ বানিয়েছে। তার-ই নাম পাকিস্তান। কিন্তু এই পাকিস্তান যে ঠিক কোথায়, সেটাই কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না। তার কারণ, আধা-ই হোক আর পুরা-ই হোক, কোনো পাগল-ই জানত না সে এখন ভারতে

না পাকিস্তানে। সে যদি এখন ভারতে, তাহলে পাকিস্তান কোন চুলোয়? আর সে যদি এখন পাকিস্তানে, তাহলে, যাচ্চলে, এই না সেদিন এটা ভারত ছিল!

এই ভারত-পাকিস্তান-এর চক্করে সবাই ভ্যাবাচ্যাকা। এই তো সেদিন, এক পাগল, ঝাড়ু দিতে দিতে কী খেয়াল হল, চড়ল গিয়ে এক গাছের মগডালে; সেখান থেকে ঝাড়া দু-ঘণ্টার বক্তৃতা। যতই তাকে নামতে বলা হয়, সে ততই ওপরে ওঠে। শেষে উত্তম-মধ্যমের ভয় দেখালে সে ওখান থেকেই ঘোষণা করল, 'না ভারত না পাকিস্তান, এই বৃক্ষ আমার বাসস্থান।' বোঝো কাণ্ড!

আরেক মুসলিম রেডিও ইঞ্জিনিয়ার, কারও সাথে তেমন মেশেটেশে না, চারপাশের ভাবগতিক দেখে একদিন হঠাৎ তার সব জামাকাপড় খুলে পুঁটলি বেঁধে এক পাহারাদারের হাতে দিয়ে নাঙ্গা হয়ে সটান বাগানে।

অন্য একজন, সে আবার সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ-এর বড়ো সমর্থক, দিনের মধ্যে পনেরো-ষোলো বার স্নান করে, ঘোষণা করল, তার নাম মহম্মদ আলি জিন্নাহ্! তাই দেখে এক শিখ বলল, সে গুরু তারা সিং! পাছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে, তাই ওই দুই পাগলকে তড়িঘড়ি আলাদা করার ব্যবস্থা হল।

ওদিকে এক অল্পবয়সি হিন্দু উকিল, লাহোরের ছেলে, অমৃতসরের এক মেয়েকে ভালোবেসে পাগল হয়েছে। দেশভাগের সময়, কী হিন্দু, কী মুসলমান, সব ছোটো-বড়ো নেতাকে প্রবল গালমন্দ করেছে, কারণ এতে তার প্রিয়তমা হয়েছে ভারতীয় আর সে হয়েছে পাকিস্তানি। এখন চারপাশের কানাঘুষোয় লাহোর ভারতের অংশ হয়ে যাবে শুনে তার সে কী আনন্দ! ইয়ার-দোস্ত এসে অভিনন্দন পর্যন্ত জানিয়ে গেল! কিন্তু সে অনেক ভেবে দেখলো, লাহোর ছাড়ার তেমন ইচ্ছে তার নেই, কারণ অমৃতসরে তেমন পসার জমবে না।

দুই অ্যাংলো পাগল, যারা কিনা ইংরেজরা চলে যাওয়ার পরে যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে একটা গোটা বিকেল নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস করেছিল, তারা রকমসকম দেখে খুব চিন্তায় পড়ে গেল পাছে তাদের রোজ সকালে নেটিভ পাগলদের সাথে রুটি আর ছাতু খেতে হয়!

এইসব ভিন্ন ভিন্ন পাগলের মধ্যে যার কথা না বললেই নয়, সে এক শিখ। নাম বিষেণ সিং। পাঞ্জাবের এক গ্রাম তোবা তেক সিং-এ তার বাড়ি। তাই লোকে তাকে ডাকতই তোবা তেক সিং! গত পনেরো বছর ধরে পাগলাগারদে। কথা বিশেষ বলত না, শুধু থেকে থেকে ছড়া আওড়ত, 'ছাতের ওপর শুকোচ্ছে ডাল, হুঁশের খাতা খালি / রাতকানারা বের হয়েছে লণ্ঠনেতে ঠুলি'। লোকে বলে, এই পনেরো বছরে সে নাকি একবারও দু চোখের পাতা এক করেনি। মাঝে মাঝে তাকে দেয়ালে হেলান দিয়ে জিরোত দেখা যেত বটে, কিন্তু লোকে এ-ও বলে যে বিছানায় তার পিঠ পর্যন্ত ঠেকেনি এই পনের বছর। সে কেবল দাঁড়িয়ে থাকত। এতে তার পা গেছিল ভয়ানক রকম ফুলে, কিন্তু সে পাগলের তাতে কিছু আসতো-যেতো না। ইদানীংকালে, চারপাশের আলোচনায় তার বেশ আগ্রহ জন্মেছিল; এর-তার কথা শুনত মন দিয়ে। জানতে চাইত, তোবা তেক সিং সীমানার এ-পারে পড়বে না ও-পারে। তেমন সাহায্য অবশ্য কেউ-ই করতে পারত না। কী করেই বা পারবে! একবার শোনে, আগে যে শিয়ালকোট ছিল ভারতে, এখন সেটা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। লাহোর, তা নাকি যে কোনো সময় পাকিস্তান ছেড়ে ভারতের আওতায় পড়তে পারে। আরে, গোটা ভারতটাই যে পাকিস্তান হয়ে যাবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? কিংবা দুটো দেশ-ই হয়তো পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেল। কে বলতে পারে!

বুড়ো বিষেণ সিং-এর মাথায় চুল ছিল হাতে গোনা। সে চুল বাড়তে বাড়তে তার লম্বা দাড়ির সাথে মিশে বিচিত্র দেখাত। কিন্তু যতই ভয়াবহ দেখতে হোক না কেন, বিষেণ সিং ঠান্ডা মানুষ — কারোর সাতেপাঁচে থাকে

না। ছিল তোবা তেক সিং-এর প্রভাবশালী জমিদার, হঠাৎ কী কারণে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাড়ির লোক ধরে বেঁধে পাগলাগারদে নিয়ে আসে। আগে মাসে একবার তারা দেখতে আসত, কিন্তু পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য তা-ও বন্ধ হয়েছে বহুদিন। যদিও বিষেণ সিং-এর দিনক্ষণের হিসেব ছিল না, তবু কেমন করে যেন বুঝত বাড়ির লোক কবে দেখতে আসবে। সেদিন নেয়েধুয়ে পরিপাটি হয়ে অপেক্ষা করত। পাগলাগারদে আসার সময় তার ছিল সদ্যজাত এক মেয়ে; সে এখন পনেরো বছরের ফুটফুটে কিশোরী। বাবার পাশে বসে অঝোর ধারায় কাঁদত, কিন্তু বাপের তাতে কোনো বিকার ছিল না। বলার মধ্যে সে শুধু আওড়াত তার ঠুলি আঁটা বুলি।

তোবা তেক সিং-এর মনে বড়ো অশান্তি। একেই তো কেউ বলতে পারে না তোবা তেক সিং ভারতে পড়বে না পাকিস্তানে। তার ওপর বাড়ির লোক আসা বন্ধ হয়ে ইস্তক দুটো সুস্থ মানুষকে জিজ্ঞাসা করার অবকাশও নেই। মানুষজন এলে বিষেণ সিং-এর ভালোই লাগত। হাতে করে এটা ওটা আনত, বসে দুটো কথা বলত। তার বিশ্বাস তার পরিবার তখনো তোবা তেক সিং-এই থাকে; কাজেই সেই গ্রাম এখন কোন দেশে, তার বাড়ির লোকের থেকে ভালো আর কেউ-ই বলতে পারবে না।

তবুও একদিন কী মনে করে একজনকে গিয়ে শুধোল। সেই পাগল আবার নিজেকে আল্লাতালা বলে। বিষেণ সিং-এর প্রশ্ন শুনে স্মিত হেসে বলল, 'রোসো, এখনো ভেবে দেখিনি।' তার হাতে অনেক কাজ, মাথায় অনেক চিন্তা; তাই বিষেণ সিং-এর আন্তরিক অনুরোধ সত্ত্বেও এক্ষুণি 'ভেবে দেখা' অসম্ভব। এতে বিষেণ সিং-এর মাথা গেল গরম হয়ে। চোখ পাকিয়ে আঙুল নাচিয়ে বলল, 'হুঁশ আছে কারও? ছাতের ওপর শুকোচ্ছে ডাল / গুরুজির খালসা গুরুজির জয়, যো বোলে সোনিহাল সৎ শ্রী অকাল'। আসলে বলতে চেয়েছিল, 'তুমি ব্যাটা মুসলমান ভগবান, তাই এই শিখের কথা ভেবে দেখবে না।'

হস্তান্তরকরণের ক-দিন আগে এই বিষেণ সিং-এর সাথে তার এক মুসলিম বন্ধু দেখা করতে এল। পনের বছরে এই-ই প্রথম। ততদিনে বিষেণ সিং-এর স্মৃতি আগাগোড়া ঝাপসা হয়ে গেছে। পেয়াদা বলল, 'চিনতে পারছ না? তোমার পুরোনো বন্ধু ফজল দীন।' ফজল দীন বিষেণ সিং-এর কাঁধে হাত রাখল, 'অনেকদিন ধরেই আসব ভাবছি, কিছু খবর দেওয়ার ছিল। তোমার বাড়ির সবাই ভালো আছে, তারা এখন ভারতে। তোমার মেয়ে, রূপ, সে-ও।' একটু ইতস্তত করে বলল, 'রূপের জন্য চিন্তা কোরো না, ভালোই আছে। তুমিও তো কদিনের মধ্যেই ভারতে যাবে, বলবীর ভাই-কে বোলো আমি ভালোই আছি। যে বাদামি গরু দুটো আমাকে দিয়ে গেছিলেন, বোলো দুটো-ই বাচ্চা দিয়েছিল। একটা বাচ্চা অবশ্য ছ-দিনের মাথায় মারা যায়। বোলো, ওনাদের কথা খুব মনে হয়।'

এই পর্যায়ে বিষেণ সিং জানতো চাইল, 'তোবা তেক সিং এখন কোথায়?'

'কেন? যেখানে ছিল।'

'কোথায় ছিল? ভারতে না পাকিস্তানে?'

'ভারতেই তো। হ্যাঁ, ভারতেই ... নাকি পাকিস্তানে? না ভাই, পাকিস্তানে। তোমার জন্য গাছের কুল এনেছিলাম। খেয়ো।'

বিষেণ সিং আর একটিও কথা না বলে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল : 'ছাতের ওপর শুকোচ্ছে ডাল, হুঁশ নেইকো মোটে/থুতু ফেলে ডুবে মরুক ভারত-পাক জোটে।'

ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা সম্পন্ন হল — দুই দেশের সরকারের মধ্যে নামের তালিকা আদান প্রদান, দিন, ক্ষণ। এক হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় লরি বোঝাই করে পাগলের দলকে নিয়ে যাওয়া হল ওয়াঘাহ্ সীমান্তে।

কিন্তু সমস্যা হল তাদের লরি থেকে নামিয়ে অন্য পারে পাঠানো। এক দল গ্যাঁট হয়ে বসে রইল, কিছুতেই নামবে না। আরেক দলকে যাও বা নামানো গেল, তারা ছাড়া গরুর মতো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল। মুক্তির আনন্দে কেউ দিগম্বর, জামা পরালেও ছিঁড়ে ফেলে দেয়, কেউ গলা ফাটিয়ে গান গায়, কেউ গাল পাড়ে, কেউ কাঁদে। মহিলারা তো আরও সরব। সব মিলে সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড! অধিকাংশেরই মাথায় ঢুকছে না কেন তাদের একটা অচেনা অজানা জায়গায় গা-জোয়ারি করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একদিকে রব উঠছে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', অন্য দিক বলছে 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ'! পুলিশ তড়িঘড়ি এসে সামাল না দিলে লেগে যাচ্ছিল ওখানেই।

এইসব হট্টগোলের মধ্যে যখন বিষেণ সিং-এর পালা এল আমলাদের কাছে নাম লেখানোর, সে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে জানতে চাইল, 'তোবা সিং কোথায়? ভারতে না পাকিস্তানে?'

'পাকিস্তানে', হাসির হুল্লোড়ের মধ্যে জবাব এল।

ব্যাস। অমনি বিষেণ সিং পিছন ফিরে তার পাকিস্তানি সাথীদের দিকে ছুট লাগাল। পুলিশে ধাওয়া করে তাকে যাও বা ধরল, ঠেলেঠুলে সীমানার কাছে আর নিতে পারে না! কত বোঝায়, আজ হোক, কাল হোক, দশ-কুড়ি বছর পরেই হোক, তোবা তেক সিং একদিন ভারতেরই অংশ হয়ে যাবে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! টেনে-হিঁচড়েও বিষেণ সিং ওরফে তোবা তেক সিং-কে একচুল সরানো গেল না। শেষ পর্যন্ত, বুড়ো মানুষ কী আর ঝামেলা করবে ভেবে তাকে তার মতো ফেলে রেখে সবাই অন্য পাগলদের হস্তান্তরের দিকে মন দিল। রাত তখন অনেক।

পরের দিন সূর্য ওঠার ঠিক আগে, হঠাৎ এক রক্ত জল করা চিৎকার! এপারের কাঁটাতারের বেড়ার পিছনে পাকিস্তানি পাগলের দল, ওপারের কাঁটাতারের বেড়ার পিছনে ভারতের, সবাই চেয়ে দেখল গত পনেরো বছর ধরে শতবর্ষী বটগাছটির মতো দাঁড়িয়ে থাকা তোবা তেক সিং দুই দেশের মাঝে নামহীন জমির চিলতেটুকুর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে।

বিষেণ সিং-এর আজগুবি বাণীর অর্থ অনুধাবনে সাহায্য করার জন্য অমিত সারওয়াল এবং রাজ মানকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

I am thankful to my dear friends Amit Sarwal and Raj Mann for helping me with Toba Tek Sing's nonsensical gibberish.

শতবর্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ললিতাগৌরী রায় (১৯৬৯)

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন বিজ্ঞান জগতে এক সুপরিচিত নাম। অ্যাসোসিয়েশনের পথচলা শুরু কলকাতায় ১৯১৪ সালে। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয় অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা। বর্তমানে মেম্বারের সংখ্যা তিরিশ হাজারের বেশি। এই অ্যাসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল —

- ভারতীয় বিজ্ঞান-চর্চার অগ্রগতি অব্যাহত রাখা।
- ভারতের যে-কোনো প্রান্তে প্রতি বছর বার্ষিক অধিবেশন সংগঠিত করা এবং সেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, গবেষণা বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করা।
- বিজ্ঞান বিষয়ক প্রসিডিং, জার্নাল এবং অন্যান্য গবেষণা সংক্রান্ত লেখা প্রকাশ করা।
- বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অর্থ, ফেলোশিপের ব্যবস্থা করা।
- নবীন ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করা।

১৯১৪ সালের ১৫-১৭ জানুয়ারি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে। ওই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সেই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন ১০৫ জন বৈজ্ঞানিক। ছ'টি বিভাগে (উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, মানবজাতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, ভৌতবিজ্ঞান ও প্রাণীবিদ্যা) মোট পঁয়ত্রিশটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্র পেশ করা হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন, কোনো একটি বিশেষ ভাবধারার উপর ভিত্তি করে।

কয়েকটি বিশেষ অধিবেশনের কথা উল্লেখ করা যাক —

অধিবেশন	সন	স্থান	সভাপতি	সভাপতির ভাষণের প্রতিপাদ্য বিষয়
প্রথম	১৯১৪	কলকাতা	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	বিজ্ঞান কংগ্রেস সম্বন্ধীয় (About science congress)
পঞ্চবিংশতি (রৌপ্যজয়ন্তী)	১৯৩৮	কলকাতা	স্যার জেমস জীনস	গবেষণা — ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনে (Researches in Great Britain)
পঞ্চদশ (স্বর্ণজয়ন্তী)	১৯৬৩	দিল্লি	অধ্যাপক ডি.এন. কোঠারি	বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয় (Science and the University)
ষষ্ঠদশ (হীরকজয়ন্তী)	১৯৭৩	চণ্ডীগর	ড. এস ভাগবন্তম	ভারতীয় বিজ্ঞানের ষষ্ঠদশ বর্ষ (Sixty years of Science in India)
পঁচাত্তর (প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী)	১৯৮৮	পুনে	অধ্যাপক সি. এন. আর. রাও	(Frotiers in Science & Technology)
একশত (শততম জয়ন্তী)	২০১৩	কলকাতা	ড. মনমোহন সিং	ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে বিজ্ঞান (Science shaping the future of India)

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার জে. সি. বোস, অধ্যাপক সি. ভি. রমণ, অধ্যাপক এস. এন. বোস, অধ্যাপক এম. এন. সাহা, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাবা, ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন, ডঃ আর. এ. মাশেলকর এবং আরও অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি প্রতি বছর উপস্থিত থাকতেন এবং সকলকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। আজ একশো বছর পর অনেক পরিবর্তন এসেছে দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি নির্ধারণে এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস দেশের সীমানা পার হয়ে পৌঁছে গেছে বিশ্বের দরবারেও।

এ-বছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শততম অধিবেশনের যোগদানকারীর সংখ্যা ছিল ষোলো হাজার, উদ্যোক্তা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সহ উদ্যোক্তা ছিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, এস. এন. বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী এম. কে. নারায়নন এ-বছরের ঐতিহাসিক শততম অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সহ উদ্যোক্তা সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যোগদানকারী সকলকে স্বাগত জানান। শততম অধিবেশন উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি। তাঁর ভাষণে বারবার উঠে এসেছে জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, সি. ভি. রমন সহ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নাম। পাশাপাশি দেশে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আক্ষেপ শোনা গেছে রাষ্ট্রপতির গলায়।

প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন 'জিন পরিবর্তিত খাদ্য, পরমাণু বিদ্যুৎ, মহাকাশ গবেষণার মতো জটিল বিষয়ের নিষ্পত্তি বিশ্বাস, আবেগ এবং ভয় দিয়ে হবে না। বরং যথাযথ বিতর্ক বিশ্লেষণ এবং সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইসব বিষয়কে অনুধাবন করা বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলি বোঝার মতোই জরুরি।'

এই উপলক্ষে কিশোর সায়েন্স কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন আমাদের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ড. এ. পি. জে. আবদুল কালাম ৪ জানুয়ারি সকাল এগারোটায়।

ঐ দিনই অপরাহ্ণে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী জয়পাল রেড্ডি মহিলা বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। এবার মূল বিষয়বস্তু ছিল বিজ্ঞান জগতে মহিলাদের অবস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়ন। বিজ্ঞান কংগ্রেসে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ড. এ. পি. আবদুল কালাম ছোটোদের বললেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সি. ভি. রমন, হোমি জাহাঙ্গির ভাবার মতো বিজ্ঞানীদের কথা। উঠে এল ঈশ্বরকণা বা হিগস বোসনের মতো ভারী বিষয়ও। কেন্দ্রীয় তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় কপিল সিব্বল শততম অধিবেশন স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেন।

এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাঁচজন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী — ড. ভেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণন, ড. ইচি নেগিসি, ড. জেমস নির্লেস, ড. আর. কে. পাচুরি, ড. স্যামুয়েল সি. টিং। দেশের অন্তত দশ জন উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ভাটনগর পুরস্কারে ভূষিত বারোজন বিজ্ঞানী এই অধিবেশনে অগণিত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ড. স্বামীনাথন বলেন জিন পরিবর্তিত শস্য ও পরমাণু বিদ্যুৎ ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে পরমাণু বিদ্যুৎ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগে। তিনি আরও বলেন ভারতকে ২০২০-এর মধ্যে বিশ্বে প্রথম পাঁচটি বিজ্ঞানে উন্নত দেশের মধ্যে থাকতে গেলে দেশে বহু গবেষণাগার তৈরি করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গেই বিজ্ঞান কংগ্রেস আয়োজক কমিটির প্রধান রাজ্যপাল এম. কে. নারায়নন জানান মেধাবী গবেষকরা বিদেশে চলে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানে উন্নতি করতে হলে তাঁদের ফিরিয়ে আনতে হবে। মেধাবী গবেষক — বিজ্ঞানীদের ফেরাতে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

আগামী বছর (১৯১৪ সনে) ফেব্রুয়ারি মাসে অধিবেশন বসবে উত্তর ভারতের কোনো জায়গায়। প্রবীণ নবীন খুদে বৈজ্ঞানিক গবেষকরা যোগ দেবেন তাঁদের গবেষণা পত্র নিয়ে। গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান উজাড় করে দেবেন যোগদানকারী বিজ্ঞানীদের ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে এভাবেই বিজ্ঞানের মশাল বহন করে নিয়ে যাবে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম। আমরা অপেক্ষা করে থাকব বিজ্ঞান চেতনা ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এক নতুন ভারতবর্ষের।

বিজ্ঞপ্তি

প্রাক্তনীদের মুখপত্র 'প্রৈতি'-তে লেখা দেবার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। বছরের যে কোনো সময়ে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের কাছে লেখা জমা দেওয়া যাবে। লেখা জমা দেবার শেষ তারিখ আধ্যাত্মিক শিবিরের দিনটি। লেখা জমা দেবার ঠিকানা ঃ

শ্রীমতী সোমা দে জোয়ারদার
প্রাক্তন ছাত্রী ও শিক্ষিকা
নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়
৫, নিবেদিতা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৩

শ্রীমতী মমতা চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্রী
৭৭/১ রামকান্ত বোস স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৩
দূরভাষ ঃ ২৫৫৪-৪০২৭

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী ঃ

১। সাদা/লাইন টানা ফুল স্কেপ কাগজে এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন।

২। লেখার জেরক্স কপি গৃহীত হবে না।

৩। মনোনয়নের বিষয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর মতামত চূড়ান্ত।

৪। পূর্ব প্রকাশিত লেখা প্রকাশিত হবে না।

৫। মনোনীত/অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্য নয়।

৬। লেখার শেষে নাম, ঠিকানা, দূরভাষ, পেশা এবং কোন সালে উত্তীর্ণ — তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

এস্পেরান্তো একটি ভাষার নাম

মীনা দাঁ (১৯৭৫)

বাংলা অনুবাদে এস্পেরান্তো শব্দটির অর্থ আশাবাদী। কীসের আশা? পৃথিবী ব্যাপী শান্তির আশা, সামাজিক ন্যায়নীতির আশা, মানবাধিকারের মতোই ভাষা অধিকার লালনের আশা। কেমন করে? একটি ভাষার হাত ধরে, যার নাম এস্পেরান্তো, যার বয়স একশো পঁচিশ বছর পূর্ণ হল গত ২৬ জুলাই, ২০১২-তে। শুনতে অদ্ভুত লাগছে? তাহলে বলি দু-চার কথা।

ল্যাজারুস লুদভিক জামেনহফ, সংক্ষেপে জামেনহফ। একজন ইহুদি মানবদরদি চোখের ডাক্তার। একজন অসামান্য স্বপ্নদ্রষ্টা। পেশায় তিনি মানুষের দৃষ্টির বাধা দূর করেন। আর নেশায় তিনি মানুষের ভাববিনিময়ের বাধা দূর করেন। তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন এই পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাষার আড়াল তিনি অপসারণ করবেন। তিনি যেখানে জন্মেছেন ও শৈশব কাটিয়েছেন সেই বিয়ালিস্তোক—বর্তমানে পোল্যান্ডে—নামের জায়গাটায় চারটে দলের মানুষ বাস করত—জার্মান, পোল, রাশিয়ান ও ইহুদি। এমনকী স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে এ-রকম চারটে স্পষ্ট ভাগ ছিল। যে-যার নিজের দলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত, কোনো দল অন্য দলের ভাষা বুঝত না, বা বোঝার চেষ্টাও করত না। ফলে প্রত্যেক দলই অন্য দলকে তাদের শত্রুপক্ষ মনে করত আর সারাক্ষণই তাদের মধ্যে মারদাঙ্গা লেগে থাকত। জামেনহফ বলছেন — তিনি ছোটোবেলায় চারপাশে শুধু পোল, জার্মান, রাশিয়ান আর ইহুদিদের দেখতেন, কোনো সম্পূর্ণ মানুষ খুঁজে পেতেন না। তিনি বুঝেছিলেন যে ভাষার বিভিন্নতাই এই অশান্তির কারণ। এই অশান্তি, এই বিরোধ দূর করার ভাবনাটা তাঁর তখন থেকেই তৈরি হয়।

এর পরের গল্পটা এক টেস্ট টিউব বেবির। জামেনহফ ছাত্রাবস্থাতেই ছক কষতে শুরু করলেন এক সহজ সরল ভাষার, যা সকলেই নিজের নিজের মাতৃভাষার পাশাপাশি শিখবে, সারা পৃথিবী জুড়ে, যে ভাষার মাধ্যমে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলবে, ভাষার আড়াল দূর হবে, সকলে সকলকে বুঝবে, ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ হানাহানির অবসান ঘটবে। বিশ্বশান্তির পন্থা নির্মাণ। ১৮৮৭-র ২৬ জুলাই প্রকাশিত হল এস্পেরান্তোর উনুয়া লিব্রো, প্রথম বই। এই বইতে জামেনহফ পাঠকদের দায়িত্ব দিয়ে বললেন, 'দেখো তো, এই ব্যাকরণটা কেমন কাজ করছে, কোথাও ভুল হচ্ছে কী, হলে আমাকে বলো'। একটা ভুল বেরিয়েছিল, সেটা তিনি সংশোধন করেন। তারপর বলেন, 'এবার আমার কাজ শেষ। এই ভাষা এবার ব্যবহারকারীদের সম্পত্তি। তারাই লালনপালন করে বাঁচিয়ে রাখবে একে'। এবার তো স্পষ্ট হল কেন সাল-তারিখে এস্পেরান্তোর বয়স মাপা সম্ভব আর কেনই বা এটি টেস্ট টিউব বেবির সঙ্গে তুলনীয়? পাশাপাশি এটাও বোঝা গেল যে বাংলা, হিন্দি, ইংরিজি, আরবি, তামিল, তেলুগু, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, চিনে, জাপানি, ওঙ্গে, আকা-জেরু, সোয়াহিলি, জুলু ইত্যাদি ভাষার থেকে এস্পেরান্তো জাতে আলাদা। এগুলো সব ন্যাচারাল/এথনিক/গোষ্ঠী ভাষা, আর এস্পেরান্তো কৃত্রিম/নির্মিত ভাষা। এস্পেরান্তোর আগেও কিছু কিছু কৃত্রিম ভাষা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তুলনায় সহজ-সাবলীলতর ব্যাকরণ ও ভাষার রাশ নিজেদের হাতে থাকার কারণে বর্তমানে এস্পেরান্তোই সজীবতম কৃত্রিম ভাষা, যার ভাষীয় সংখ্যা উইকিপিডিয়ার হিসেবে কুড়ি লক্ষ আর অনুবাদ ও নিজস্ব রচনা মিলিয়ে এসপেরান্তোর ভাণ্ডারে এখন

চল্লিশ হাজারেরও বেশি বই। এই ভাষীরা ছড়িয়ে রয়েছেন একশোর ওপর দেশ জুড়ে। তাই একশোর ওপর দেশ জুড়ে পালিত হয়েছে এস্পেরান্তোর একশো পঁচিশতম জন্মদিন।

এবার নজর দেওয়া যাক এস্পেরান্তোর বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে।

প্রথমত, এস্পেরান্তো বহু পরিচিত রোমান হরফ ব্যবহার করে আর এখানে বানান আর উচ্চারণে কোনো তফাত নেই। অর্থাৎ এ ভাষায় ইংরিজির to-do-no-so-go-র মতো অবিবেচনা বা বাংলার শ-স-ষ-এর মতো বিভ্রান্তি অনুপস্থিত। এস্পেরান্তো বানানে a থাকলেই চোখ বুজে আ উচ্চারণ করা যায়, আর উচ্চারণে আ শুনলেই বানানে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে a লেখা যায়। প্রতিটি বর্ণের ধ্বনিমান নির্দিষ্ট। আর ভাষার ব্যাকরণে আছে মাত্র ষোলোটি সূত্র, যার প্রত্যেকটিই ব্যতিক্রমবিহীন। যেমন, বিশেষ্যের শেষে - ও, বিশেষণে - আ, ক্রিয়া বিশেষণে - এ ; ক্রিয়ার তিনটি কাল, বর্তমানের বিভক্তি - আস, অতীতের - ইস, ভবিষ্যতের - ওস ইত্যাদি। এ-সব নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই বলে ভাষাটি সহজে, কম সময়ে ও সর্বোপরি নিজে নিজেই শেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, এস্পেরান্তো কাজ করে একটি সহায়ক ভাষা হিসেবে, মাতৃভাষার পাশাপাশি। মাতৃভাষাকে গ্রাস করে নয়। এবং বিশ্ব জুড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে গড়ে উঠেছিল জাতি সংঘ বা লিগ অভ নেশনস। ১৯২১-এ ভারত, পারস্য, আর্জেন্টিনাসহ মোট সাতটি দেশ, তৎকালীন লিগ অভ নেশনস-এর যারা সদস্য, প্রস্তাব করে জাতি সংঘ যেন বিবেচনা করে দেখে যে পৃথিবীর সমস্ত ইস্কুলে এস্পেরান্তো পড়ানো যাবে কিনা। ১৯৫৪-এ হল রাষ্ট্র সংঘ বা ইউনাইটেড নেশনস, তার শাখা ইউনেস্কো এস্পেরান্তোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্ব এস্পেরান্তো সংস্থাও ইউনেস্কো পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত। অধুনা এস্পেরান্তো আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষা বা ইন্টারন্যাশনাল অক্সিলিয়ারি ল্যাংগুয়েজ হিসেবে স্বীকৃত।

তৃতীয়ত, এস্পেরান্তো কাজ করে একটি সেতু ভাষা হিসেবে। অনুবাদের সেতু। শুধু যে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য এস্পেরান্তোতে অনূদিত হয় তাই নয়, এক ভাষার সাহিত্য এস্পেরান্তোর মাধ্যমে অন্য ভাষায় অনূদিত হয়।

চতুর্থত, এস্পেরান্তো একটি নির্ভেজাল সমদর্শী ভাষা। এ ভাষা কারুর মাতৃভাষা নয়। সকলকেই চেষ্টা করে শিখতে হয়। অর্থাৎ কারুরই পৈতৃক সম্পত্তি নয়, লড়ে নেওয়া জমি। ফলে কারুর কোনো বিশেষ সুবিধাস্বত্ব নেই। আজকের পৃথিবীতে ইংরিজিভাষীরা অন্যদের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকার সুযোগ পায়, সেই সুযোগে আধিপত্য চায় জগৎ জুড়ে। এস্পেরান্তো কোনো ভাষাঘটিত দাদাগিরিতে ইন্ধন দেয় না। উপরন্তু এস্পেরান্তো মাতৃভাষার অধিকার, স্ব-সংস্কৃতির অধিকার রক্ষায় সদা সচেষ্ট। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে আসলে হিউম্যান রাইটসের প্রধান যে দলিলটা, ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অভ হিউম্যান রাইটস, সেটার মূল খসড়া লিখেছিলেন একজন তরুণ এস্পেরান্তোভাষী, যাঁর নাম রালফ হ্যারি। তিনি একজন বড়ো ডিপ্লোম্যাট ছিলেন। কম বয়সে তাঁকে এই কাজটা দেওয়া হয় এবং তাঁর প্রভাবে তখনকার বিশ্ব এস্পেরান্তো আন্দোলনের বড়ো নেতা ইভো লাপেন্না, যিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক আইনের লোক, সেই লাপেন্না এই রালফ হ্যারির কথায় ১৯৪৭ সালে বিশ্ব এস্পেরান্তো সংস্থার সনদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন যে আমরা মানবাধিকারের জন্য লড়ব। আর বিশ্বমানবাধিকার সনদ গৃহীত হয় তার পরের বছর, ১৯৪৮-এ। এইসব কারণে এস্পেরান্তোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা শব্দগুলি হল আন্দোলন, সাংস্কৃতিক অধিকার, বন্ধুত্ব, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি। এইসব পরিচয় নিয়েই এস্পেরান্তো

নিরন্তর লড়াই করে শান্তির জন্যে। এই লড়াইয়ের জন্যে মূল্যও দিয়েছে অনেক। তোজোর জাপান, হিটলারের জার্মানি, স্তালিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মুসোলিনির ইতালি—এই চারটে দেশ এস্পেরান্তো আন্দোলনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা এস্পেরান্তো গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দিয়েছে, এস্পেরান্তো কর্মীদের হত্যা করেছে কিংবা যাবজ্জীবন বন্দী করে রেখেছে। জামেনহফের পরিবারের অনেক সদস্যেরই শেষ ঠিকানা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। সে-যুগে অত্যাচার ছাড়া এস্পেরান্তো রাষ্ট্রদের কাছ থেকে খুব যে কিছু সমর্থন পাচ্ছিল তা নয়। এস্পেরান্তো সমর্থন পেয়েছে জনতার কাছ থেকে, সব সময়ে।

এতক্ষণে হয়তো মনে একটা প্রশ্ন উঁকি মারছে যে হাতের নাগালে এত ভালো আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরিজি থাকতে আবার এস্পেরান্তোর প্রয়োজনটা কী? এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজনকে ছাপিয়ে ওঠে দুইয়ের মধ্যে তফাতটা। দুশো বছরের ঔপনিবেশিকতা প্রভাবিত আমরা ভারতীয়রা একসময় জানতাম ইংরিজি হল শাসকের ভাষা। আর বর্তমান পৃথিবীতে আমরা জানি ইংরিজি হল আন্তর্জাতিক ভাষা। একই সঙ্গে আরও জানি যে ইংরিজি হল ক্ষমতার ভাষা, দাপটের ভাষা, ডমিনেশনের ভাষা। বিপরীতে এস্পেরান্তো হল ডমিনেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা, সাম্যবাদের ভাষা, বিশ্বব্যাপী প্রতিটি এস্পেরান্তোভাষীর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ভাষা, বন্ধুত্বের জাল বুনে বুনে মানুষকে বিশ্বশান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভাষা। ইংরিজির সাম্রাজ্য আছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের কোনো আশ্বাস নেই। দু-চারটে বন্ধুত্ব হয়তো হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধুত্বের চেষ্টার ওপর ইংরিজি দাঁড়িয়ে নেই। মানুষ ইংরিজি শেখে কোনো না কোনো স্বার্থের তাগিদে। কিন্তু এস্পেরান্তো শেখে একটা আইডিওলজি থেকে, ভালোবেসে। রাষ্ট্রের বা সিলেবাসের চাপে পড়ে নয়। তাছাড়া আমরা যে নজরে ইংরিজির দিকে তাকাই, বলা বাহুল্য, বাকি পৃথিবী সেই একইভাবে ইংরিজির দিকে তাকায় না। অনেক রাষ্ট্রেই ইংরিজি কল্কে পায় না। মোটামুটি বন্ধুত্ব আর শান্তির জায়গাটা থেকে বলা যায় যে পৃথিবীতে মানুষ ক্রমশ বুঝতে পারছে যে শান্তির জন্যে সত্যিই চেষ্টা করা দরকার। কারণ যুদ্ধাস্ত্র সাজাতে থাকলে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই শান্তির চেষ্টা যতটা জরুরি এস্পেরান্তোও ততটা জরুরি।

এর পরেও এস্পেরান্তো সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন বাকি থাকলে বা কৌতূহল বেড়ে থাকলে যেতে হবে www.lernu.net-এ। এখানে সাজানো আছে অসংখ্য আকর্ষণীয় তথ্য, ভাষাটা নিজে নিজে শেখার সরঞ্জাম, অশেষ সাহিত্যভাণ্ডার, গান-বাজনা, চুটকি, প্রবাদ, গেমস, বিতর্ক, খবর, ছবি - এক কথায় একটা ভাষায় আমরা যা চাইতে পারি সবই এবং সবই ফ্রি! আর ওই যে কথায় বলে - Google helps her who helps herself !

হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে

ভগবতী বোস

আমি ভগবতী বোস। ১৯৩৮ সালে প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিলুম। নিবেদিতা স্কুলে তখন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছিল, ১৯৩৬ সালে আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়তাম। তখন স্কুল অ্যাফিলিয়েশন পায়নি, তাই দুবছর প্রাইভেটে পড়ে বেথুন স্কুলের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়েছিলুম। নিবেদিতা স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হই। স্কুলের তখন একতলা বাড়ি, উঠোন, ঠাকুরদালান। আর সারদা মায়ের বড়ো ছবি ঠাকুরদালানে। স্কুলে ঢুকে সিঁড়ির তলায় জুতো খুলে পা ধুয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হত। আমরা ছাত্রী সংখ্যায় ছিলাম ন-জন। প্রবেশ করার পরই গেট বন্ধ হয়ে যেত, তার দায়িত্বে ছিলেন একজন মহিলা। স্কুলে বাংলা, সংস্কৃত-ই পড়ানো হত, অঙ্ক অল্পস্বল্প করানো হত। আমরা বিনা পয়সায় পড়তাম। ইংরাজি তখন শেখানো হত না। আমি অবশ্য পরে ইংরাজি শিখি এবং ১৯৪০ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করি। শিক্ষিকাদের মধ্যে ছিলেন তনুদি, ইন্দিরাদি, বাণীদি, পাখীদি, আর মীরাদি ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা। সহপাঠীদের মধ্যে প্রতিমা বিশ্বাস, সুধা বিশ্বাস ও কনক ঘোষের নাম মনে পড়ে। আজও স্কুলের ঠাকুরদালান, প্রেয়ার-এর সময়টা ভাবতে ভালো লাগে। প্রেয়ারের সময়টা থাকত পিন-ড্রপ সাইলেন্স। ওখান থেকে পেয়েছি শান্তভাব, স্থিরতা, ডিসিপ্লিন, পরে যা আমার সন্তানকে ও নাতি-নাতনিদের দেবার চেষ্টা করেছি। ওদের ছোটোবেলায় ওরা আমার কাছে রামায়ণ, মহাভারত স্বামীজির গল্প শুনতে ভালোবাসত।

আমার মার পিসি ছিলেন যোগীন মা, যিনি সারদা মায়ের কাছের মানুষ ছিলেন। মাও তাঁর ছোটোবেলায় যোগীন মার সাথে সারদামায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। উদ্বোধনের কাছেই যোগীন মায়ের বাড়ি অর্থাৎ আমাদের মামার বাড়ি। আমাদের বাড়ি ছিল ১৪নং বোসপাড়া লেন, গিরিশ ঘোষের পাশের বাড়ি। তখন রাস্তা ছিল না। গিরিশ ঘোষের বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে যুগলদির সাথে স্কুলে যেতুম। অনেকদিন বাদে পুরানো ছোটোবেলার কথা বলতে, মনে করতে খুব ভালো লাগল।

উমা বোস

আমি উমা বোস, প্রথম শ্রেণি থেকে নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯৪৮ সালে দশম শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তখন শিক্ষিকাদের মধ্যে রমাদি, মাধুরীদি, নির্মলাদি, কমলাদির কথা মনে আছে। স্কুলবাড়ি দোতলা ছিল, ঠাকুরদালান, উঠোন খুব ভালো লাগত। স্কুলে জুতো খুলে যেতে হত, ক্লাসে খালি-পায়ে মাদুর পেতে সামনে বেঞ্চ রেখে

পড়া হত। আমরা বাংলা, ইংরাজি, সংস্কৃত, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভুগোল সব বিষয় পড়েছি। আমরা বাড়ির জামা অথবা শাড়িই স্কুলে পরতাম, ইউনিফর্ম ছিল না। বরাবর স্কুলে সব শ্রেণিতে প্রথম হয়েছি। পুরো স্কুলে প্রথম ছাত্রী হিসাবে মেডেল পেয়েছিলাম। তখন আমি অষ্টম অথবা নবম শ্রেণিতে পড়ি, স্কুলে মণিমেলা তৈরি হল, তার নাম দেওয়া হল 'নিবেদিতা মণিমেলা', তাতে যোগ দিলাম। তার ডিরেক্টর ছিলেন মৌমাছি (বিমল ঘোষ), তাঁর আমি প্রিয় পাত্রী ছিলাম, তাঁর দেওয়া মেডেল আজও আছে। মণিমেলাতে ড্রিল, ব্রতচারী শেখানো হত। সুচীশিল্পে পুরস্কার পেয়েছিলাম। শেয়ালদা ম্যানসনে বক্তৃতা দিয়েও পুরস্কার পাই। সব কাজে আমার খুব উৎসাহ ছিল, কোনো কিছু পারব না এটা কখনো ভাবতাম না। পরবর্তী পর্যায় কাব্যতীর্থ (M.A) 1st Class নিয়ে পাশ করি। বিবাহের পর পরিবারের সহায়তায় হাওড়া যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হই। স্কুলে যেহেতু সংস্কৃত চর্চা, গীতা পাঠ করেছি। শিক্ষকতা জীবনে গীতা কমপিটিশনের তালিমের দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রশংসা পাই। জীবনে সন্ন্যাসীনিদের প্রভাব আজও যেন কোথাও অনুভব করি। ছোটোবেলায় মায়ের কাছে সিস্টার ক্রিশ্চিনের কথা, মার পিসি যোগীন মার কাছে মা সারদার কথা খুব শুনতাম। আজও ওই স্কুলের ছাত্রী হিসাবে গর্ব অনুভব করি, কোনো নিন্দা শুনলে খুব গায়ে লাগে। আমি যে পরিবারের মেয়ে অর্থাৎ নন্দলাল বসুর পরিবার, যিনি ঐ স্কুলের থামের কারুশিল্প ও বিশেষত সরস্বতীর বিশেষ চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন — ভাবলে বড়ো ভালো লাগে। আজ আমার ছেলেবেলায় ফিরে গিয়ে স্মৃতিচারণ করে আরও কিছুটা জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পেলো।

রেনু বোস

আমি রেনু বোস। ১৯৫৩ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিই। প্রথম শ্রেণি থেকে নিবেদিতা স্কুলে পড়ি। একবার ডবল প্রোমোশন পাই। আমাদের সময় রেণুদি (বিমল ঘোষের শ্যালিকা) প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। লক্ষ্মীদি ইংরাজি, কমলাদি বাংলা পড়াতেন। নবম শ্রেণিতে ভাবসম্প্রসারণে দশে নয় পেয়েছিলাম। আমার লেখা দিদিমণি সবাইকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। আমার হাতের লেখা ভালো ছিল বলে সবার হাতের লেখা খাতার প্রথম লাইনটা আমায় লিখে দিতে হত। আমি আঁকতামও ভালো আর প্রথম হয়েছিলাম বলে ক্লাসে প্রথম বেঞ্চে বসতাম। শান্ত স্বভাবের ছিলাম, অন্যরা ঝগড়া করলে দিদিমণি আমাকে বলতেন মিটমাট করাতে। স্কুলে নাচ, গান, অভিনয় সবেতেই অংশগ্রহণ করতাম। একবার বিজলীদির নির্দেশনায় রামায়ণ নাটকে সীতার চরিত্রে অভিনয় করে পুরস্কার পাই। বোর্ডিং-এর মেয়েদের সঙ্গে আমার ভালো বন্ধুত্ব ছিল। ওরা বাইরে থেকে এসে ওখানে থাকত। উঠোনে কিত্‌কিত্ খেলা হত। আমি খেলাধুলোতেও ভালো ছিলাম। আমাদের সময়ও 'নিবেদিতা মণিমেলা' ছিল। মণিমেলায় ড্রিল, ব্রতচারী শেখানো হত। আমি প্রথম সারিতে থাকতাম। আমাদের সময় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মণিমেলা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজ, লেডি ব্রেবন কলেজ, শেয়ালদা ম্যানসন প্রভৃতি। আমরা পরস্পরকে মণিবোন, মণিভাই বলে সম্বোধন করতাম। সকলের মধ্যে নিবেদিতা মণিমেলা প্রথম হয়েছিল। পরে এই অনুষ্ঠান সিনেমার প্রথমে যে ট্রেলার দেখানো হয়, তাতে দেখানো হয়েছিল। আমরা গাছে জল দিচ্ছি, কাপ নিয়ে যাচ্ছি ইত্যাদি। শেয়ালদা ম্যানসনে আমার দিদির বক্তৃতাও দেখানো হয়। আমাদের সময়ও ইউনিফর্ম

ছিল না। দু'টাকা করে মাইনে হয়েছিল। স্কুল থেকে বেলুড় মঠ গেছি। মার মুখে শুনেছি বোসপাড়ায় বগলাবাড়িতে ঠাকুর এসেছিলেন। আমার বড়োমাসি নবদুর্গা বোস নাকি সিস্টার নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিশ্চিনের কাছে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। গোল্ডেন জুবিলির বইতে নাকি ছবিও বেরিয়েছিল। পরবর্তীকালে আমার মেয়ের কাছে যখন আমেরিকাতে যাই, সেখানে রামকৃষ্ণ মঠে গেছি, স্বামীজি ম্যানহাটানে যে বাড়িতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে গেছি। ওখানে আমার পরিচয় পেয়ে তাঁরা খুব সম্মান জানান। আমি সোজা মনের মানুষ, ঠাকুর যেমন ছোঁয়াছুঁয়ি করতেন না, স্বামীজি যেমন জাতিভেদ করতেন না, আমার মনেও ওসব নেই। কারুর দুঃখে অনেক সময়েই আমার পরনের শাড়িও আমি দিয়ে দিয়েছি। যতদিন চোখ ভালো ছিল রোজ এক অধ্যায় করে গীতা পড়েছি। আজ আবার বাল্যকালে ফিরে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য, বড়ো আনন্দ হল! ভালো পরিবারে জন্ম, আর ভালো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করাও ভাগ্য বলে মনে করি আর এই জন্য ঠাকুরের কাছে আমি বড়ো কৃতজ্ঞ।

সুস্মিতা বোস
(১৯৮০)

আমি সুস্মিতা বোস এই পরিবারেরই একজন। এঁরা আমার পিসি ঠাকুমা। এঁদের সঙ্গে স্মৃতিচারণের সময়টা বড়ো মধুর ছিল। এঁদের বাল্যকালের কথা বলার সময় চোখে সেই ছেলেবেলার আনন্দ, হাসিতে সেই সরলতা, সারা মুখময় এক অদ্ভুত দীপ্তি আমাকেও নিয়ে গেল আমার স্কুল জীবনে। সবারই ভালো লাগাগুলো এক হয়ে গেল। ঠাকুরদালান, মায়ের ছবি, উঠোন, প্রেয়ারের সময়টা। সিস্টার যেমন তাঁর গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা ধরে আছেন, আমরা সবাই যেন এক একটি রুদ্রাক্ষ, আর সবাইকেই সিস্টার যেন একই মালার মধ্যে গেঁথে ধরে রেখেছেন। সংসারী হয়েও কোথাও যেন আমরাও সন্ন্যাসীনি। সবার মনের মূল অংশটি একই। আজ আমিও ধন্য ও কৃতজ্ঞ ঠাকুরের কাছে; এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাবার জন্য। আমরা এই বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রী যে দৃঢ়তা ছোটোবেলা থেকে স্কুলে দেখেছি, পেয়েছি তা যদি আমরা আমাদের প্রজন্মে ছড়াতে পারি, মেয়েদের তাদের আত্ম-মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করতে পারি তাহলেই বোধহয় এই শিক্ষার সঠিক মূল্যায়ন হবে। স্বামীজির কাছে আমাদের প্রার্থনা তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে নিমিত্তমাত্র হয়েও যেন আমরা সমাজের জন্য কিছু করার সুযোগ পাই।

নিবেদিতা

মিত্রবিন্দা ঘোষ (১৯৯২)

পূর্ণ করেছো তুমি আমায়,
জীবনের উষাকাল থেকে, মায়ের স্পর্শের মতো
নিবিড় আশ্বাস দিয়ে, প্রত্যেক মুহূর্ত ছিলে ভরে।
যখনই এসেছে ঝড়, কালরাত্রি অবিচল —
নিবিড় নিখাদ অন্ধকার,
তখনই পেয়েছি দেখা, কেটে গেছে সব বাধা,
ভেঙে গেছে সবটুকু ভয়
তোমার শক্তির স্পর্শ ছুঁয়ে গেছে অবিরত,
পুণ্যস্পর্শে জেগেছে অন্তর।

নিবেদিতা — নিবেদিত তুমি,
যে তোমাকে চেয়েছে জানতে,
জেনেছে সে সবটুকু দিয়ে
নিবেদন করা কাকে বলে।
আমার 'আমি'-র কাছে প্রত্যেক মুহূর্ত পরাজিত,
তাই আজ জেনেছি তোমায় —
স্বামীজি - মানসকন্যা প্রত্যেক অর্থে নিবেদিত।

অনেক অনেক দিন আগে,
কোনো এক অন্ধকার রাতে,
জ্বেলেছিলে দীপ শত শত —
তোমার প্রকাশসম, আজও তারা দীপ্যমান,
প্রজ্জ্বলিত নিত্য অবিরত।

তোমার প্রেমের স্পর্শ, আজও রেখেছে ঘিরে,
অন্তরে দিয়েছে বিশ্বাস,
এমনি ভাবেই তুমি শক্তি হয়ে থেকো সাথে —
অনন্তের দিওগো আশ্বাস।

শেখালে জগতে তুমি, নিবেদন কাকে বলে,
কতখানি দিলে দেওয়া হয় —
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা — একাধারে তুমি সবই,
শক্তির আজ হোক জয়।

পশ্চিমের আকাশে ও মাটিতে

পার্বতী চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৫)

এক শীতের কাঁচা রোদ মাখানো সকালে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মেয়ে বলল, মা চলো পশ্চিমের দেশগুলো একটু ঘুরে আসি। আমাদের সকলের মন নেচে উঠল। ভারতের প্রায় সর্বত্র ঘোরা হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াও ভ্রমণ করে এসেছি। মন এবার নতুন দেশ দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। কথাটা সকলের মনেই ঝড় তুলেছে। সবাই আমরা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। মন তৈরি হলে বাকি কাজ খুবই দ্রুত গতিতে চলে। আমাদের দলটি সেই পুরোনো — মেয়ে, জামাই, ছোট্ট নাতি আর আমি। নতুন কোনো সদস্য আসেনি।

এখন ইন্টারনেটের যুগ। কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই টিকিট কাটা এবং হোটেল বুক করা হয়ে গেল। ইউরোপে সেই সময় খুব ঝড়-বৃষ্টি চলছে, দারুণ ঠাণ্ডা, হাড়কাপানো শীত — ইন্টারনেটে সবই দেখছি। আমাদের কিন্তু উৎসাহে একটুও ভাঁটা পড়েনি।

২০১১ সালে ৩০ মার্চ সকলে ৯টায় বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। এ আই ১৪৩ নম্বর প্লেনে উঠে বসলাম। ছাড়ার সময় দুপুর ১-১০ মি. কিন্তু ছাড়ল ২-৪০ মিনিটে। কারণ রানওয়েতে যানজট। যাই হোক, প্যারিসের উদ্দেশ্যে বিমান উড়ল। ওড়ার শুরুতে একটু বেশি রকমের দুলুনি ছিল। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা উড়ছি। ৪০,০০০ হাজার ফুট নিচে বরফে ঢাকা হিন্দুকুশ পর্বত, মাঝে মাঝে বরফে ঢাকা কাস্পিয়ান সাগর, ব্ল্যাক সি-র অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন ভরে গেল। আমার সামনের টিভিতে প্লেনের সব গতিবিধি ফুটে উঠছে। কখনো টিভি কখনো বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমি অন্য জগতে চলে যাচ্ছি। এইভাবে ৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিট কাটার পর আমরা প্যারিস এয়ারপোর্টে পৌছলুম। মার্চ মাসের শেষ কিন্তু ভয়ানক ঠাণ্ডা কারণ মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের পূর্ব নির্দিষ্ট হোটেল 'সুরাট' থেকে গাড়ি এসে সকলকে নিয়ে গেল। এয়ারপোর্ট থেকে ২০ মাইল দূরে হোটেলটি অবস্থিত। এখানে ইংরেজি খুব কম লোকই বোঝে। গাড়ির ড্রাইভার আর হোটেলের মালিক ইংরেজি জানে। এখানকার হোটেলগুলোয় শুধু প্রাতরাশই দেয় কাজেই বৃষ্টির মধ্যেই আমাদের খাবারের সন্ধানে বেরোতে হল, অনেক কষ্টে একটা রেস্তোরাঁ খোলা পাওয়া গেল। লাইন দিয়ে সামান্য কিছু খাবার পেলুম। পানীয় জল এখানে বড়োই মহার্ঘ। খাবারের সঙ্গে এরা জল পরিবেশন করে না। অনেক ইউরো খরচ করে বাধ্য হয়ে জল কিনতে লাগলুম। অবশেষে জানা গেল হোটেলের সব জলই পানের যোগ্য। কোনো ভয় নেই। খাবারে কোনো ভেজাল নেই। আমাদের দেশে মিনারেল ওয়াটারেও ভেজাল। রাতের খাবার সেরে হোটেলে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলুম।

১ এপ্রিল প্যারিসের ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'আইফেল টাওয়ার' দেখার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

সকাল ১০টায় প্রাতরাশ সেরে টিউব রেলে চড়ে হপ অন - হপ অফ বাসে চড়ে 'আইফেল টাওয়ার' পৌঁছলুম। নির্মাতার নামানুসারেই টাওয়ারের নামকরণ। এটি উচ্চতায় ১০৫০ ফুট। ওখানেই একটা দোকানে দুপুরের খাওয়া সারলুম। প্রচুর পায়রা, আমাদের ঘিরে ধরল, কাজেই খাবারের ভাগ দিতে হল। বৃষ্টি কিন্তু

পড়েই চলেছে। ভিজে ভিজেই আমাদের বেড়ানো চলছে। টাওয়ারের চারদিকে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান। আমরা অনেক ছবি তুললুম। টাওয়ারের প্রথম ৫০ ফুট হেঁটে উঠতে হবে, একদম ওপরে ওঠার জন্যে পরে লিফট পাওয়া যাবে। বিরাট লাইন পড়েছে ভ্রমণকারীদের। আমরা এ-ব্যাপারে কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে ফিরে এলুম। হপ অন-হপ অফ বাস একটু অন্য ধরনের। বাসে কোনো কনডাকটর নেই। ড্রাইভার টিকিট দিল। ইচ্ছেমতো বাসে ওঠা যায় না। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। ড্রাইভার খুললে তবে ঢোকা যায়। এই বাসে চড়ে আমরা শহর দেখতে বেরোলুম। টিকিটের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেককে ইয়ারফোন দিল। আমরা সবাই ওপরে উঠে গেলুম। ওপরটা সম্পূর্ণ খোলা — চারদিকের দৃশ্যটা ভালোভাবে উপভোগ করার জন্যে। বাস চলার সঙ্গে সঙ্গে কমেন্ট্রি চলতে লাগল, আমরা ইয়ারফোনের মাধ্যমে নিজের নিজের সুবিধে মতো ভাষায় ভাষ্য শুনতে লাগলুম ও দৃশ্যমান সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত হলুম। প্রথমে বাস প্রবেশ করল মিউজিয়াম চত্বরে। চতুর্দিকে বিরাট সব অট্টালিকা, অপূর্ব কারুকাজ করা এত বিশাল জায়গা যে হেঁটে ঘোরা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি প্রাসাদে প্রাচীন ভাস্কর্যের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। আমরা অনেক ছবি তুললুম।

২ এপ্রিল সকালে প্রাতরাশ সেরে বেলা ১২ টায় প্রাইভেট কারে ডিসনিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলুম। প্যারিস থেকে ডিসানল্যান্ডের দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। ১৫০ মাইল গতিতে গাড়ি চলল। আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা বহু আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছলুম। হোটেলের নাম Sejours & Afairs Rive Ganche. হোটেলটি ভারী সুন্দর। সব রকমের সুবিধে আছে। আমরা বাইরেই লাঞ্চ, ডিনার সারলুম।

৩ এপ্রিল প্রাতরাশ সেরে মেট্রো করে ডিসনিল্যাণ্ডে পৌঁছলুম। মেট্রোর টিকিট কমপিউটারে হয়। ডিসনিল্যাণ্ড সত্যিই এক রূপকথার দেশ। শৈশবে পড়া রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে আমরা যতটা হতবাক ততটাই মোহিত। আমাদের চেনা জগতের সঙ্গে এর যেন কোনো মিল নেই। কল্পনার চোখে আমাদের যে ছবি আঁকা আছে এ যেন তারই বাস্তবরূপ। এ শুধু শিশুদের মন কাড়ে না। বয়স নির্বিশেষে সকলেরই মন কেড়ে নেয়। অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে আমরা আনন্দ উৎসাহের জোয়ারে ভেসে চললুম। এখানে বহু রকমের রাইড আছে। তার জন্যে আলাদা করে কোনো টিকিট কাটতে হয় না। ডিসনিল্যাণ্ডে প্রবেশ মূল্যের সঙ্গে ওটা ধরে নেওয়া আছে। পুরো দু-দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরলে সবটা দেখা যায়। এত বৃষ্টি সত্ত্বেও রাস্তাঘাট আনাচে কানাচে কাদার লেশমাত্র নেই। রাস্তার দুধারে সুন্দর গাছের সারি, কোথাও বা দৃষ্টিনন্দন মৌসুমী ফুলের বাগান। গাছের গোড়ায় যে মাটি আছে সেটা পলিথিন পেপার দিয়ে সুন্দর করে মুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে একফোঁটা মাটি বাইরে না আসতে পারে।

সল্টলেকের নিক্কোপার্কে যে টয়ট্রেন আছে তার তুলনায় আরেকটু সুন্দর টয় ট্রেনে করে আমরা ডিসনিল্যাণ্ডটা পুরো ঘুরলুম। যাত্রাপথে কোথাও বা অন্ধকার গুহা পড়ল। দুপাশে অশরীরী আত্মা, আবার বাঘমশাই ওত পেতে চুপচাপ বসে আছে। হঠাৎ দেখলে শিশুরা ভয়ার্ত হয়ে উঠবে। আসলে এগুলো সবই নকল। গায়ে অল্প অল্প শিহরণ লাগিয়ে আমরা উপভোগ করতে লাগলুম।

এরপর আমাদের লক্ষ্য-স্থল ভূতবাংলো। পাহাড়ের টিলার ওপর গা ছমছম করা এক বাংলো। এখানে পাঁচ বছর অবধি শিশুরা ঢুকতে পারে না। দরজা জানলা বন্ধ এক বাড়ির সামনে দর্শকরা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ প্রধান দরজাটি খুলে গেল, আমরা ভেতরে প্রবেশ করলুম। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, নিজের হাতটাও দেখা যায় না। আমাদের

গাইড একটি মোবাবাতি জ্বালাল। হঠাৎ অনুভব করলুম আমরা নীচে নামছি। সহসা এস্‌ক্যালেটারে পা পড়ল, সামনে চলন্ত ট্রেন। চোখের পলকে উঠে বসতে হল। ট্রেনটা একটা গুহার মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। দুধারে মানুষ প্রমাণ রাক্ষস রাক্ষসি ডাইনি বিকট আওয়াজ করে চেঁচাচ্ছে। শিশুদের পক্ষে সত্যিই বীভৎস দৃশ্য। হঠাৎ আলো দেখা গেল। আমাদের যাত্রার সমাপ্তি। চলন্ত ট্রেন থেকে এস্‌ক্যালেটারের ওপর ঠিক ব্যালেন্স করে নামতে হবে, বেসামাল হলেই পপাত ধরণীতল। এরপর আমরা এক অদ্ভুত ধরনের ট্রেনে উঠলুম। সিটগুলো চারদিকে খোলা, মাথাও খোলা, রাজসিংহাসনের মতো দেখতে। সামনে একটা মোটা লোহার রড দুজন করে বসার জায়গা। ট্রেন চলতেই ঐ রড দিয়ে আমাদের আটকে দিল, যাতে পড়ে না যাই। রেললাইনটা কিন্তু সমতলে পাতা নয় — পাহাড়ের গায়ে পাতা। পাহাড়ের গা বেয়ে কাত হয়ে ট্রেন চলল। আশ্চর্য আমরা কেউ উল্টে পড়লুম না। যদিও প্রতি মুহূর্তে পড়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। ট্রেনের গতি খুব কম ছিল। যাই হোক এরপর আমরা ভাগ হয়ে গেলুম। একদিকে আমি আর মেয়ে। অপরদিকে জামাই এবং ছোট্ট নাতি। ওরা গেল কয়েকটা বিপদজনক খেলা খেলতে। দূর থেকে দেখেই আমরা দুই বীরাঙ্গনা বিপরীত দিকে হাঁটতে লাগলুম।

আমার মেয়ের খুব কেনাকাটার শখ। আবার ভোজনবিলাসীও বটে। চারদিকে বিচিত্র রকমের পোশাক, খাবার সাজিয়ে দোকানগুলি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এ-প্রলোভন সংবরণ করা গেল না। কিছু গরমজামা সওদা করে খাবারের দোকানে রসনা তৃপ্তি করে নিলুম। মাথায় ছাতা দিয়ে চলতে লাগলুম। হঠাৎ দেখি স্টিমার ঘাট। বিরাট লাইন পড়েছে স্টিমারে ওঠার জন্যে। আমরা দুই উৎসাহী ভ্রমণকারী লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লুম। স্টিমার আসতেই সব হুড়মুড়িয়ে দোতলায় উঠে গেল। আমরা একতলায় ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়লুম। স্টিমার ছেড়ে দিল। তীরে ভারী মজার মজার দৃশ্য — কোথাও এক চিন্তিত নাবিক, অসহায়ভাবে বসে আছে, আবার কোনোখানে জাহাজের ভাঙা টুকরো দেখা যাচ্ছে। জলে হাঁসগুলো নির্ভয়ে সাঁতার কাটছে। কোনো জীবন্ত মানুষ কিন্তু জলে নামে না। এক পাক ঘুরিয়ে স্টিমার আমাদের ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে এল। ঘড়িতে দেখি রাত আটটা বাজে। হোটেলে ফেরার কথা মাথায় এল। সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে আমরা সবাই ভিজে সপসপে। হোটেলে ফিরে গরমগরম খাবার খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমের অতল তলে তলিয়ে গেলুম।

৪ এপ্রিল প্রাতরাশ সেরে আমরা প্রাইভেট কারে করে প্যারিস নর্ড স্টেশনে আমস্‌টারডাম্‌ যাওয়ার জন্য পৌঁছলুম। বুলেট ট্রেনে ৪০০ মাইল গতিতে ৩ ঘণ্টা ১৮ মিনিট বাদে আমরা আমস্‌টারডাম্‌ পৌঁছলুম। অত্যধিক গতি থাকা সত্ত্বেও কোনো অসুবিধা হয়নি। সিটগুলো খুব সুন্দর। খাবারেরও সুবন্দোবস্ত আছে। অনেকটা প্লেনের মতো আমস্‌টারডাম্‌ পৌঁছে হোটেল (Hotel et... stotania)-তে পৌঁছলুম।

পরদিন ৫ এপ্রিল প্রাতরাশ সেরে ট্রামে করে বাস স্টপেজে এসে হপ অন-হপ অফ বাসে উঠলুম। এখানে প্রতিটি রাস্তায় ক্যানাল আছে। ক্যানালের ওপর ১৫০টি ব্রিজ আছে। সবকটি ক্যানাল আমস্‌টারড্‌ নদীতে পড়েছে। নদীর নামানুসারেই দেশের নাম আমস্‌টারডাম্‌। নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। নদীতে বোট চলছে। আমরা একটি বোটে উঠে বসলুম। আমাদের ভিডিও ক্যামেরায় ছবি উঠতে লাগল। খানিকটা যাওয়ার পর এক হীরের কারখানা এল। কিছু যাত্রী কারখানা দেখার উদ্দেশ্যে নেবে গেল। আমাদের নির্দিষ্ট সময়ে ফিরতে হবে বলে আর নামতে পারলুম না। লোভ সংবরণ করে চলে এলুম। ধারাভাষ্য শুনতে শুনতে নদীতে পড়লুম এবং ক্রমশ নদীর মোহনায় পৌঁছে গেলুম। একপাশে নদীর জল অপর পাশে সমুদ্রের জল — অপূর্ব দৃশ্য। সামনে বিরাট বিরাট ৮/১০টি

জাহাজ নোঙর করে আছে। এক ঘণ্টা ঘোরার পর আমরা ক্যানালে চলে এলুম। হপ অন - হপ অফ বাসে ইয়ারফোনের সাহায্যে ধারাভাষ্য শুনতে শুনতে ট্রাম স্টপেজে এসে ট্রামে করে গন্তব্য হোটেলে পৌঁছলুম।

এখানে ফুটপাতে মানুষ এবং সাইকেল একসঙ্গে চলে। সাইকেলের রাস্তাটা লাল রঙে চিহ্নিত। সাইকেল আরোহী ইচ্ছে-মতো গতিতে সাইকেল চালায়, পথচারীকে সাবধানে পার হতে হয়। সাইকেল, বাইক ভাড়া পাওয়া যায়। রাতে রাস্তাতেই লক্ করে রেখে যায়।

৬ এপ্রিল প্রাতরাশ সেরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলুম, উদ্দেশ্য স্টেশন। স্থানীয় সময় ৮-৩১ মিনিটের ট্রেনে মিউনিখ-এর দিকে রওনা দিলুম। এখানকার মানুষ সময়াভাবের কারণে রাতের ট্রেনে ওঠে না। প্লেনই ব্যবহার করে। এই কারণেই রেল কোম্পানি প্যাসেঞ্জারের সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে নজর দেয় না। খাবার বলতে গ্রহণের অযোগ্য পানীয় আর শুয়রের মাংস। অতএব আমাদের ভাগ্যে হরি-মটরই জুটল।

পরদিন ৭ এপ্রিল সকাল ৭-১৬ মিনিটে মিউনিখ পৌঁছলুম। স্টেশনে অনেক ডবলডেকার ট্রেন দেখলুম। গাড়ি নিয়ে হোটেল উইন্টার মিউনিখ সিটিতে পৌঁছে প্রাতরাশ সারলুম।

প্যারিস, ডিসনিল্যাণ্ড, আমস্টারডাম্ তিন জায়গাতেই প্রচুর বৃষ্টি পেয়েছি। মিউনিখ-এ এসে সূয্যিমামার দর্শন মিলল। ভালো করে বাঙালির মতো স্নান সেরে শহর দেখতে বেরোলুম। ছিমছাম ছবির মতো শহর। রাস্তায় কোথাও এক টুকরো কাগজ পড়ে নেই। রাস্তাঘাট সব ঝকঝক তকতক করছে। শুয়ে পড়লেও গায়ে ধুলো লাগবে না। কারণ ধুলোই নেই। হবুচন্দ্র রাজা ধুলোর হাত থেকে বাঁচার জন্যে চর্ম দিয়ে পৃথিবী মুড়ে দিতে চেয়েছিল। হায়রে! রাজা হবুচন্দ্র তো ইউরোপ ভ্রমণ করেনি।

এখানে একটি চীনে রেঁস্তোরায় আমরা দুপুরের আহার পর্ব সমাধা করলুম। সুযোগ পেলেই দুপুর ও রাত্রের খাবার ভারতীয় রেঁস্তোরাতেই সমাধা করতুম। রাত ৯টা অবধি এ-সব জায়গায় রাতের খাবার পাওয়া যেত। ইউরোপবাসী সন্ধে ৬/৭ টার মধ্যেই রাতের খাবার খেয়ে নেয়। কাজেই ৮টার মধ্যেই রেঁস্তোরাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় রেঁস্তোরায় হোটেল বয় খাবার পরিবেশন করে। ইউরোপীয় রেঁস্তোরায় নিজের খাবার নিজেকে নিয়ে আসতে হয়। সমস্ত লাগেজ নিজেকে বইতে হয়। সেই কারণে সবাই চাকা লাগানো লাগেজ ব্যবহার করে, স্টেশনও কোনো কুলি পাওয়া যায় না। এ-নিয়ম ইউরোপের সর্বত্র।

৮ এপ্রিল সকালে প্রাতরাশ সেরে স্টেশনে পৌঁছে স্থানীয় সময় দুপুর ১১টা ২৭ মিনিটের ট্রেনে ভিয়েনা যাত্রা করলুম। বিকেল ৩টে ৪৪ মিনিটে ভিয়েনা পৌঁছলুম। আমাদের পূর্ব নির্ধারিত 'হোটেল সিনেটর' থেকে গাড়ি এসে গেল। ঝকঝকে বিলিতি গাড়ি করে হোটেলে পৌঁছে পূর্ণ বিশ্রাম।

প্যারিস এবং জার্মানিতে অর্থাৎ মিউনিখ-এ ঘর খুলতে হয় চাবি দিয়ে। বাকি সব জায়গায় দরজায় কার্ড ঢুকিয়ে খুলতে হয়। বন্ধ করার সময় হাতে কার্ড নিয়ে বাইরে থেকে টেনে দিতে হয়। আলো জ্বালতে গেলে ভেতরে এসে একটি বিশেষ জায়গায় কার্ড ঢোকাতে হয়। ভিয়েনাতে টেবিল ল্যাম্প আর স্ট্যানডিং ল্যাম্প জ্বালাতে হলে একটা টোকা মারতে হয়। জোর আলোর প্রয়োজন হলে ২-৩টে টোকা মারতে হয়। নেবাতে হলে একটা টোকা মারতে হয়। এখানে রাত হয় অনেক দেরিতে। বিশ্রামের পর আমরা রাতের খাবার খেতে বেরোলুম। রাস্তায় সারি সারি বিলিতি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেশে এগুলোর দাম ৭০ লাখ থেকে ১ কোটি পর্যন্ত।

এখানে কিন্তু এগুলো ট্যাক্সি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। একটি ওদেশি হোটেলে ঢুকে কোনোরকমে রাতের খাওয়া সেরে আমাদের হোটেলে ফিরে এলুম। নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমে আচ্ছন্ন।

৯ এপ্রিল সকালে প্রাতরাশ সেরে বাসে চড়ে শহর ঘুরতে বেরোলুম। অসাধারণ সব বাড়ি ঘর। এগুলোকে অট্টালিকা ছাড়া অন্য নাম দেওয়া যায় না। প্রত্যেকটি অট্টালিকায় ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। মানুষের মুর্তিগুলো যেন জীবন। নানা ভঙ্গিতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে — কোথাও ঘোড়ার পিঠে তলোয়ার হাতে যোদ্ধা ছুটছে। এরা এতই জীবন্ত যে মনে হয় না পাথরে তৈরি, ৫০০/৭০০ বছরের পুরোনো অট্টালিকা হলেও মনে হয় সদ্য তৈরি হয়েছে। এদের সংরক্ষণ এমনই সুন্দর। সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এগুলো দেখতে দেখতে Schonlerunn Palace-এ এসে পৌঁছলুম। বৃষ্টি ছিল না রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, কিন্তু হাওয়ার গতি ছিল প্রচণ্ড। প্যালেসের মাঠে নানারকমের পসরা নিয়ে দোকানিরা বসে আছে। কোথাও নানাদেশি খাবার আবার কোথাও বা নানাদেশি শৌখিন জিনিসে ভরা। হোটেলে ফিরে পূর্ণ বিশ্রাম নিলুম। বহুদিন আগে কলকাতায় যেমন গ্যাসের ল্যাম্পপোস্ট ছিল, ভিয়েনাতেও ঐরকম ল্যাম্পপোস্ট দেখলুম যা ইউরোপের অন্য কোনো দেশে দেখিনি।

১০ এপ্রিল হোটেলে প্রাতরাশ সেরে এয়ারাপোর্টের উদ্দেশে রওনা দিলুম। ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই প্রাতরাশ মোটামুটি একই রকম — পাউরুটি, বান, ঠাণ্ডা দুধ ও ডিম, মাখন, চীজ, জ্যাম, জেলি ফলের রস, পীচ, আপেল, পাকা পেঁপে, আনারস ইত্যাদি আস্ত ফল। এ ছাড়া মাংসের নানারকম খাবার ইউরোপের সব জায়গায় দেখলুম। ডিমগুলো গোলাকার এবং খোসার রঙ হালকা হলদে। প্রাতরাশ বুফে — যার যত খুশি খাও।

এয়ারপোর্টে একটু আগেই পৌঁছেছিলুম। দিল্লির প্লেন ছিল স্থানীয় সময় দুপুর ১-৫ মিনিট। ভিয়েনাকে বিদায় জানিয়ে 0S-6032 নাম্বার ফ্লাইটে ভারতের উদ্দেশে উড়লুম। ভারতীয় সময় রাত ১১-৫০ মিনিটে দিল্লির আকাশে পৌঁছলুম কিন্তু অবতরণের জন্যে জায়গা না পাওয়ায় ৪৫ মিনিট আকাশে ঘুরতে হল। অবশেষে আমাদের পুষ্পক রথটি খুব ভালোভাবে ধীরে ধীরে দিল্লির মাটি স্পর্শ করল।

প্রথম আলোর দেশে

স্মৃতি মিত্র (১৯৭০)

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রান্তিক আরণ্যক অঞ্চল অরুণাচল। অরুণোদয়ের প্রথম কিরণ এখানেই পড়ে, তাই এর নাম অরুণাচল। এই প্রদেশের উদ্দেশে এ-বছরই দুর্গাপঞ্চমীর দিন ডায়মণ্ড ট্যুরস অ্যাণ্ড ট্রাভেলস-এর সঙ্গী হয়ে রওনা দিলাম সরাইঘাট এক্সপ্রেস-এ। তার আগে অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণের জন্য ইনার লাইন পারমিটের ব্যবস্থা করা হল সল্টলেক অরুণাচল ভবন থেকে। গৌহাটি পৌঁছে মা কামাখ্যা মন্দিরে পূজো দিয়ে সে রাতটা গৌহাটিতেই কাটল। পরদিন টাটা সুমোয় রওনা দিলাম ভালুকপং-এর উদ্দেশে। এখানেই চেকপোস্টে ইনার লাইন পারমিট দেখিয়ে প্রবেশ করলাম অরুণাচল রাজ্যে।

জিয়াভরলি নদী, সবুজ প্রকৃতি আর পর্বত শ্রেণি মিলেমিশে স্বাগত জানায় আমাদের। সন্ধেতে স্থানীয় অধিবাসীদের আয়োজিত দুর্গাপুজোর মণ্ডপে কিছুক্ষণ কাটল দুর্গাদেবীর আরাধনায়। খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে প্রসাদ পেলাম। পরদিন বমডিলা যাবার পথে দেখে নিলাম ভালুকপং এর টিপি অর্কিড সেন্টার। প্রায় চারশো প্রজাতির অর্কিড এখানে আছে। ছোটোবেলায় বই-এ পড়া কলসপত্রী উদ্ভিদ দেখলাম। আবার যাত্রা শুরু হল বমডিলার দিকে। ভালুকপং থেকে প্রায় ১০৯ কিমি দূর। রাস্তার অবস্থাও খুব খারাপ। অবশ্য সারা অরুণাচল প্রদেশের যে-কটি জায়গায় গেছি, প্রায় সবকটিরই রাস্তা খুবই খারাপ। অসমের জিয়াভরলি নদীই অরুণাচলে হয়েছে কামেং। এই কামেং নদীর পশ্চিমেই বমডিলা। পথে পড়ল মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট টেঙ্গা। রাস্তায় দেখলাম বৈজয়ন্তীমালা ফল্‌স। সারা বছরই ঠাণ্ডায় মোড়া থাকে বমডিলা। এখানে দর্শনীয় স্থান লাইব্রেরি, ক্রাফ্‌ট সেন্টার যেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের হস্তকলা, শিল্পকলার সঙ্গে পরিচয় হয়। আছে লোক-সংস্কৃতি মিউজিয়াম। বমডিলায় বাজার এলাকায় প্রাচীন গুম্ফাটি লোয়ার মনাস্ট্রি বলে খ্যাত। আর পাহাড়ের উপর নতুন মনাস্ট্রি রাবজাইতে লিং, এখান থেকে বমডিলা শহরটি সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়। নিস্তব্ধ পরিবেশে গুম্ফার বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আর লামাদের মন্ত্রপাঠ মনকে পবিত্র করে তোলে। সূর্যদ্বারে রয়েছে ভারত-চীন যুদ্ধে (১৯৬২) নিহত সৈনিকদের শহিদ বেদি।

পরদিন বমডিলার পরবর্তী গন্তব্যস্থল হল তাওয়াং। বমডিলা থেকে ১৮৩ কিমি দূরত্বে প্রায় ১৩০০০ ফুট উচ্চতায় তাওয়াং। চড়াই পথ ধরে সাদা পাহাড়ে মোড়া রাস্তা খুবই ভয়ংকর সুন্দর। তাওয়াং যাবার পথে পড়ে সেলা পাস ১৩৭০০ ফুট। পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম গাড়ি চলাচলের এই পাশের প্রবেশ-মুখেই তোরণ-দ্বার। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং দুরন্ত হাওয়ায় দাঁড়ানোই দুষ্কর। চারপাশে গভীর খাদ। সেলাপাস অতিক্রম করে পড়ল সেলা লেক। চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে লেকের টলটলে স্বচ্ছ জল। নীল আকাশের রঙ জলের রঙ-এ মিলেমিশে একাকার। তাওয়াং থেকে প্রায় ২১ কিমি আগে যশোবন্তগড় ওয়ার মেমোরিয়াল। ভারত-চীন যুদ্ধের সময় তিনি একাই চীনা সৈনিকদের রুখে দিয়েছিলেন ৭২ ঘণ্টা। তাঁর অসীম সাহসিকতার জন্য ভারত সরকার তাঁকে দিয়েছেন মরণোত্তর মহাবীর চক্র। এই মহান সৈনিকের কীর্তি খোদিত আছে পাহাড়ের গায়ে।

তাওয়াং বিখ্যাত তার চারশো বছরের পুরানো মনাস্ট্রির জন্য। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মনাস্ট্রিতে আছে ১৮ ফুট লম্বা সোনালি বুদ্ধের মূর্তি। এর মধ্যেই আছে একটি মিউজিয়াম। এখানে আছে বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র, নানা দেবদেবীর মূর্তি, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য, যুদ্ধাস্ত্র। আছে সহস্রবাহুতে অস্ত্রধারী সহস্রনেত্র অবলোকিতেশ্বর হাজার বছরের পুরানো বুদ্ধমূর্তি। প্রতিটি মূর্তি সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জের মিশ্রণে তৈরি। এই মঠেই জন্মগ্রহণ করেছেন দলাই লামা, এই মনাস্ট্রির অধীনে আছে দেশের আরও ১৭টি মনাস্ট্রি।

তাওয়াং হল লেকের রাজ্য। ছোটো বড়ো অজস্র সুন্দর সুন্দর লেক আছে এখানে। শহর থেকে ১৭ কিমি দূরে পিটি সো লেক। গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম ৪২ কিমি দূরে সাঙ্গে স্টার লেক। পথে পড়ল পিটি সো লেক। লেকের স্বচ্ছ জলে নীল আকাশ আর দূরের পাহাড়ের ছায়া। পিটি সো দেখে রওনা হলাম সাঙ্গে স্টার লেক বা মাধুরী লেকের উদ্দেশে। ১৯৯৬ সালে মাধুরী দীক্ষিত ও শাহরুখ খানের 'কোয়েলা' ছবির শুটিং এখানেই হয়েছিল, তাই এখন সবাই একে মাধুরী লেকই বলে। রাস্তার দুপাশে পাহাড়ের সারি। একেক পাহাড়ের পাথরের একেক রঙ। পথে নানা জায়গায় সেনাবাহিনীর ছাউনি, আর্মি চেকপোস্টে পরিচয় পত্র দেখাতে হল। পিটি সো লেক থেকে মাধুরী লেকে যাবার সময় ডানদিকের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে ভারত-তিব্বত সীমান্তে ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় বমুলা পাস — চিনের বর্ডার। কিন্তু সেনাবাহিনীর অনুমতি না মেলায় সেখানে যেতে পারলাম না। খুবই স্পর্শকাতর অঞ্চল।

তাওয়াং থেকে লোকাল সাইট সিয়িং-এ গেলাম ১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধে নিহত সেনা জওয়ানদের উদ্দেশে নির্মিত ওয়ার মেমোরিয়াল চোর্তেন। এখানে নিহত সব সৈনিকদের নাম খোদাই করা আছে। আর আছে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র সম্ভার দিয়ে সাজানো মিউজিয়াম। এ-সব দেখে মনটা খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

এবার ঘরে ফেরার পালা। তাওয়াং সফর শেষ করে আমরা আবার এলাম বমডিলায়। একরাত সেখানে কাটিয়ে সকাল ৯-৩০ মিনিটে রওয়ানা দিলাম তেজপুরের উদ্দেশে। সেই দিনই বিকেল ৬টা নাগাদ তেজপুরে পৌঁছলাম। সন্ধেবেলায় তেজপুর শহরের দুর্গাপুজোর মেলায় ঘুরতে গেলাম। স্থানীয় শিল্পকলা, পোশাক, অসমের মেখলা, মুগা শাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হলাম। পরের দিন আবার রওনা গৌহাটির উদ্দেশে। রাস্তা খুবই খারাপ। সারানোর কাজও চলছে। গৌহাটি পৌঁছে আবার এক রাত কাটিয়ে পরের দিন বারোটার ফ্লাইটে ফিরলাম নিজের একান্ত চেনা শহর কলকাতায়।

‘মা’

রিক্তা মোদক

একটি অনাথ আশ্রম,
নাম বিশেষ নেই, এক অনামী আশ্রম;
তবে আর পাঁচটা অনাথ আশ্রমের থেকে,
আলাদা হয়ে আশ্রমটির বেঁচে থাকা।
এখানে মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করা হয়,
পশু হিসাবে নয়।
মফস্‌সল এলাকার এই আশ্রমটির
মহিলা বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট পরমাদি।
আজ থেকে বছর দশ বারো আগে পরমাদি,
রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলেন একটি মেয়েকে।
মেয়েটার বয়স ছিল বছর বারো-তেরো
রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একলা ভিক্ষা করছিল।
মেয়েটা তখন সে তল্লাটে নতুন,
পরমাদি ভারী অবাক হয়েছিলেন, যখন —
প্রথম দেখেছিলেন মেয়েটিকে; আশ্রমে নিয়ে
যাওয়ার দিন সাতেক আগে।
পরমাদি নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন মেয়েটির,
বলেছিল, কোনো নাম তার।
পাশের এলাকা থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে সে,
পেটের দায়ে চুরি করতে গিয়েছিল সে।
অভ্যাস নেই, তাই চুরির দায়ে ধরা পড়ে বেদম মার খেয়েছিল।
মেয়েটা বলেছিল — ‘তবু জান্‌টা বের হল না দিদিমণি;
আর পেটের জ্বালা এমন, মনে হল ভিক্ষা করে দেখি
ব্যাপারটা কেমন। কেউ তো আর কাজ দিল না।’
মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর গায়ে আধময়লা ফ্রক্‌,
তবে মুখখানি ভারী সুন্দর; দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছা করে।
দিদিমণি জিজ্ঞাসা করেন — ‘আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে,

আমার কাছে থাকতে দিই,
তোমাকে ভালোবাসি,
তুমি কি ভালোবাসবে আমাকে?'
মেয়েটা ভারী অবাক চোখে তাকাল; বলল — 'এমন করে
এর আগে কেউ বলেনি আমাকে। আমি তোমার
সঙ্গে যাব; খেতে পরতেও তো পাব।'
দ্বিরুক্তি না করে, পরমাদি মেয়েটিকে
নিয়ে এসেছিলেন আশ্রমে।
অনেকে অনেক কথা বলেছিল, পরমাদি তোলেননি সে কথা কানে।
দিদিমণির প্রথম কাজ ছিল, রাস্তার সমস্ত ধুলো, বালি থেকে, মেয়েটিকে পরিষ্কার করা।
তারপর একে একে সব এল — নতুন জামা, নতুন পড়ার বই,
আর খাতা এবং আরও অনেককিছু
যেগুলি সম্পর্কে আশা করেনি আশ্রমের অন্যরা।
দিদিমণি মেয়েটির নাম দিলেন 'পরী'
বললেন — 'আর কখনও করবি না চুরি, এই আমার দিব্যি রইল।'
মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী, পড়াশোনাতেও ভালো,
আর মনের মধ্যে একটুও নেই কালো।
হয়তো কোনো বড়ো ঘরের মেয়ে,
খুব ছোটোবেলায় হারিয়ে গিয়েছিল।
পরী আশ্রমে আসার বছর চারেক পরের কথা —
দিদিমণি দুপুরবেলা, বসে কাগজ পড়ছেন
ঘরে ঢুকে পরী বলল —
'একটা কথা। আমি তোমাকে মা
বলে ডাকব?'
পরমাদি ভেবে পেলেন না কী বলবেন;
ঘরে কর্মরতা এক মহিলা কর্মচারী বলে উঠলেন —
'এক ভিখারি মেয়ের শখ কী;
'মা' বলে ডাকব!'
বহুদিন আগের কথা, স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার করার স্বপ্ন দেখেছিলেন;
স্বপ্ন দেখেছিলেন পরমাদি,
সম্পর্কের পবিত্র বন্ধনের উপর, বড়োই নির্ভর করেছিলেন তিনি;

কিন্তু দুনিয়াটা যে তাঁর মতো নয়;
স্বপ্ন ছারখার হয়ে যায়।
তবু আজও, পরমাদি সধবার বেশ ধারণ করে থাকেন প্রবাসী
স্বামীর মঙ্গল কামনায়।
আশায় বুক বাঁধেন তিনি,
ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে, মেরামতের চেষ্টা করেন তিনি।
তারপর, সাধারণ পরমার এক অসাধারণত্বে উত্তরণ,
ত্যাগ আর বন্ধনের মাঝে এ এক মহান জীবন।
গত বছরই এই আশ্রমটি রাজ্যস্তরে পুরস্কার পেয়েছে,
পরমাদি আর কয়েকজন একনিষ্ঠ কর্মীর দৌলতে।
পরী আগের মতোই পরমাদিকে, কখনও দিদিমণি,
কখনও মাসি, কখনও বা দিদি বলে ডাকে।
আশ্রমের সকলের থেকে পরী পড়াশোনায় সবথেকে
ভালো।
কলকাতার আশুতোষ কলেজে পড়ে,
এখন বাংলায় মাস্টার ডিগ্রি পড়ে।
আশ্রম থেকে পরীর, কলেজে যাতায়াতের জন্য গাড়ির
পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছেন,
পরমাদি, নিজের হাতে টিফিনটাও বানিয়ে দিচ্ছেন।
সপ্তাহখানেক আগে, পরীর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে।
কলেজের মধ্যে সে ফার্স্ট হয়েছে।
আগে, পরীকে আশ্রমের অনেকে, অনেক কথা বলেছে,
কিন্তু এখন পরীকে সবাই ভালোবেসে ফেলেছে।
কারণ পরী আর পরমাদি দুজনেই এই আশ্রমের সবাইকে
আর সবকিছুকে খুব ভালোবাসে, বড়ো ভালোবেসেছে।
আজ পরীদের কলেজে বার্ষিক অনুষ্ঠান ছিল,
আমি ছিলাম এখানকার আমন্ত্রিত।
আজ পরীকে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হল।
পরমাদি সহ আশ্রমের আরও দু'একজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।
এখন রাত এগারোটা,
আজকের ঘটনাটি আমি কাগজে ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করছি,

কারণ আমার পেশা সাংবাদিকতা।

অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে পরমাদি আর পরীর পৃথক
সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম।

আর মঞ্চে, পরীর পুরস্কার নেওয়ার সময় এক অপ্রত্যাশিত
ঘটনা দেখলাম।

মঞ্চে উঠে,

পুরস্কার নেওয়ার পূর্বে, পরী, মঞ্চে আসার জন্য
পরমাদিকে অনুরোধ করল।

অন্য সবাই উদগ্রীব ছিল, নেপথ্যে থাকা পরমাদিকে দেখার জন্য।

সভাপতির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের পর,

পরী সেটি, পরমাদির হাতে তুলে দিল।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে,

পরীর এক অপ্রত্যাশিত ঘোষণা,

" 'মা' কাকে বলে আপনারা জানেন?"

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা।

পরী আবার বলে উঠল — " 'মা' বলতে কী বোঝানো হয়
আপনারা জানেন?

আমি জানি;

যাঁর কথা ভাবলে মনে শান্তি পাওয়া যায়,
নিরাপত্তা বোধ হয়,

যাঁর নিঃস্বার্থ স্নেহ ভালোবাসা সর্বক্ষণ ছাতার মতো আগলে রাখে,

যাঁর কাছে নিরাপত্তা, শান্তি পাওয়ার জন্য এক অব্যক্ত
অনুভূতি নিয়ে ছুটে যেতে ভালো লাগে,

যাঁর কান্না হাসিতে আমার কান্না-হাসি,

যাঁর কাছে সমস্ত ছেলেমানুষি প্রশ্রয় পায়,

যাঁর আদুরে গলায় স্নেহের সম্বোধন আর
স্নেহমাখা বকুনি ও শাসন শুনতে
বারেবারে ছুটে আসতে হয়,

তিনিই তো 'মা'

সকলের পরমাদি তিনি —

আমি তাঁকে 'আমার মা' বলে জানি।"

প্রাক্তনী-সংসদের সভানেত্রীর প্রতিবেদন

নমিতা ভট্টাচার্য

স্কুলের পুনর্মিলন উৎসব আসন্ন খবর পেলেই মনের মধ্যে ঢাকের বাদ্যি বাজে। এ যে আমাদের সব পেয়েছির দেশে নিয়ে যায়। বাল্য ও কৈশোরের হারিয়ে যাওয়া দিনে ডুব দিয়ে হীরে মানিক কুড়িয়ে নেবার অবাধ সুযোগ করে দেয়। সতীর্থদের সঙ্গে দেখা — 'কীরে কেমন আছিস? একটা তো ফোনও করতে পারিস!' — এমন ধারা অজস্র কথা মনের আগল খুলে একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। বয়সের জীর্ণতা, প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা ভুলিয়ে সঞ্জিবনী সুধার প্রলেপ ভুলিয়ে দেয় এই উৎসব। শুধু কি সতীর্থ? প্রাচীনা নবীনা পাশাপাশি বসে কী এত গল্পে মাতে? কন্যাসমা অথবা তার থেকেও বয়োকনিষ্ঠারা জ্যেষ্ঠাদের মাসিমা, কাকিমা, জেঠিমা বা আন্টি নামে ডাকে না। জ্যেষ্ঠা প্রাক্তনীরা পুলকিত মুগ্ধ — তারা যে ছোটদের কাছে দিদি শুধুই দিদি! সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে নিরন্তর ফিসফিসিয়ে গল্প চলে। খিলখিল হাসি আর থামতেই চায় না। এরপরে আবার আছে নন্দকিশোরের শ্রীহস্তের রান্না ভোজ, মহাভোজ। টোকেন নিয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে এক এক করে খাবারের থালা হাত পেতে নিতে কী আনন্দ! যেন একেবারে বাচ্চা মেয়েটি।

বছরের শুরুতেই ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩-র শীতের আমেজ মাখানো সোনাঝরা সকাল পুনর্মিলন উৎসবের ডালি সাজিয়ে প্রাক্তনীদের আবার ডাক দিল। স্কুল নয় তো যেন ঈশ্বরের বাগান, যেখানে তাদের অনেকগুলি বছর স্বপ্নের মতো কেটেছে। এমন বিদ্যালয় পৃথিবীতে কটি আছে জানা নেই যা দেবালয় ও বিদ্যালয়ের সম্মিলিত আশ্চর্য এক সুসংহত রূপ, জগন্মাতার আশীর্বাদ আর স্বামীজির নারীশিক্ষা প্রসারের ইচ্ছার প্রকাশ — এই দুইয়ের মিলনে গড়ে উঠেছে। পদ্মসিঁড়ি বেয়ে স্কুলের ভিতরে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে শুভ্র বসনা, শঙ্খ শুভ্র দেহসৌষ্ঠবের অধিকারিণী সিস্টারের দৃপ্তভঙ্গিমার বিশাল প্রতিকৃতি। এই ছবির কাছে গিয়ে যখন মাথা নত করি শ্বেতপদ্মের গন্ধে যেন বুক ভরে যায়। আর নৈঃশব্দ্য ভেদ করে কানের কাছে শুনতে পাই 'আমার মেয়ে, আমার মেয়ে!' তিনি যে এখনও তাঁর প্রাণাধিক মেয়েদের হাত ধরে আছেন। গভীর সংকটে তাঁর নির্দেশে পথচলা। আমরা মূঢ়, অনুভূতিগুলো শানিত নয়, তাই বুঝতে পারি না। আমরা সিস্টারের মেয়ে এই গর্বে আমাদের বুক ভরে শ্বাস নেবার কথা, বুক ফুলিয়ে চলার কথা, জীবনের সব ক্ষেত্রে হার না মানার ব্রত শিরোধার্য করে সঠিক ভূমিকাটি পালন করার কথা।

প্রাক্তনীদের এই পুনর্মিলন উৎসব প্রতি বছর আরও শ্রীমণ্ডিত হয়ে ফিরে ফিরে আসুক এই আমাদের প্রার্থনা। বছরে একবার অন্তত আমাদের বাল্য ও কৈশোরকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠার সুযোগ থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আরও বেশি বেশি সংখ্যক প্রাক্তনী, সদ্য প্রাক্তনীরা অংশগ্রহণ করে এই উৎসবকে সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত করুক। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজির আশীর্বাদ আমাদের প্রাক্তনী সংসদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে দীর্ঘজীবী করুক। পান্নাসবুজ ঠাকুরদালানে শ্রীশ্রীমায়ের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে যখন মাথা নত করে তাঁর আশীর্বাদ চাই — 'মা আমায় মানুষ কর', তখন যেন মাথায় তাঁর নরম হাতের স্পর্শ অনুভব

করি। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির উপস্থিতির গন্ধও যেন অনুভব করি বিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে। তাঁদের আশীর্বাণী কি বিফল হতে দেওয়া যায়? এসো আমরা সকলে মিলে এক অকালপ্রয়াতা কবির সিস্টার সম্পর্কে কবিতার কয়েকটি অমোঘ পংক্তি একসঙ্গে উচ্চারণ করি —

‘ আজ তাই ভুলে গেছি কোন স্বপ্নটানে
একটি সোনার দেশ ছেড়ে তুমি এসেছিলে মাটির স্বদেশে
যে তুমি প্রতীক ছিলে বীরত্বের, দৃপ্ত সংগ্রামের
যে তুমি স্বহস্তে ঝাঁটা নিয়েছিলে পরিচ্ছন্নতায়
যে তুমি প্রেরণা ছিলে বিজ্ঞানের আলোবাতাসের
সেইরূপ ভুলে গেছি অকৃতজ্ঞ সন্ততি আমরা।’

Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls’ School Alumnea Association
Income & Expenditure Account for the year ended 31st March, 2012

Particulars	Rs.	Particulars	Rs.	
Postage & Telegram	1250.00	**Collection for the year :**		
Refreshment	20480.00	-Membership fees	20200.00	
Cultural Programme	3360.00	-Refreshment fees	22050.00	
Decoration	6800.00	-Advertisement	58050.00	
Registration Fees	25.00	-Donation	785.00	
Conveyance	400.00	-Adhyatmik Shibir	6750.00	107835.00
Smarok	557.00	Bank Interest		3001.00
Expenses for Adhyatik Shibir	6584.00			
Web hosting	3550.00			
Printing & Stationery	31705.00			
Tiffin Allowance	2077.00			
General Expenses	4720.00			
Excess of Income over Expenditure transferred to General Fund	29328.00			
	110836.00			110836.00

Balance Sheet as at 31st March, 2012

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Opening Balance	88178.88	Cash at Bank	
Add : Surplus	29328.00	- State Bank of India	107330.13
		Cash in Hand	10176.75
	117506.88		117506.88

সম্পাদিকার প্রতিবেদন

কাকলী দে জোয়ারদার

আজ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। নিবেদিতা স্কুলের প্রাক্তনীদের আজ পুনর্মিলন উৎসব। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে, যে কোনো বয়সে পুনর্মিলন তো উৎসবই। পরিবারের সীমিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর পরিধিতে সহপাঠীদের সাহচর্য, বন্ধুত্বের আদান-প্রদান, জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পথে চলতে ভালো-মন্দের পাঠগ্রহণ যে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র আঙিনায় — সেখানে ফিরে আসা তো আমার মনে হয় যেন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুনর্মিলন। ফেলে আসা সেই অযাচিত প্রাপ্তির জায়গাটা জীবনে পরে আর বড়ো সহজে ফিরে আসে না। এমন একটা পরিবেশকে ছেড়ে গিয়ে নতুন করে ফিরে পাবার ব্যাকুলতা কি সকলের মনেই থাকে না! নিবেদিতা স্কুলের প্রাক্তনীদের অন্তরের এই ব্যাকুলতাই গঠন করেছে প্রাক্তনী সংসদ এবং বৎসরান্তে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে পুনর্মিলন উৎসব। অবশ্য একটা ব্যাপারে একটু কুণ্ঠিত বোধ করি আমরা; শতাব্দী-প্রাচীন আমাদের স্কুলের প্রাক্তনীদের ক্ষুদ্র-প্রচেষ্টায় যোগদানকারীর সংখ্যা এখনো বড়োই কম। তবে বিশ্বাস রাখি প্রাক্তনী সংসদ সদস্য সংখ্যায় অবশ্যই দ্রুত সমৃদ্ধ হবে।

এ-যাবৎ অনুসৃত প্রাক্তনী সংসদের বর্ষব্যাপী কাজের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ সকলের জন্য উল্লেখ করছি। গত বছর ২২ জানুয়ারি পুনর্মিলন উৎসবে মিলিত হয়েছিলাম আমাদের এই বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে। শ্রী সারদা মঠের পূজনীয়া অধ্যক্ষা মাতাজির লিখিত আশীর্বাণী পাঠের মধ্য দিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা হয়। উৎসবের সভাপতি প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা মাতাজির আশীর্বাদ এবং সহযোগিতা আমাদের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রেরণা দেয়। ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও কাজের ওপর মনোগ্রাহী আলোচনা করেন আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি শ্রীমতী পূর্বা সেনগুপ্ত। প্রাক্তনীদের আয়োজনে সুন্দর সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মধ্যাহ্নভোজ আর নির্ভেজাল আড্ডায় সম্পূর্ণ হয় মিলনোৎসব।

বৈশাখী সভায় প্রাক্তনীরা মিলিত হয়েছিলেন ২২ এপ্রিল তারিখে। প্রাক্তনীদের সমবেত সংগীতের মাধ্যমে ১৪১৯-এর আবাহনে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আরও বেশি সংখ্যায় সংসদে যোগ দেবার জন্য প্রাক্তনীদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানালেন সম্পাদিকা। উপস্থিত সকলকে বৈশাখী শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রদ্ধেয়া প্রাক্তনী অনিতাদি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরলেন রবীন্দ্রনাথের কথা। 'ডাকঘর' - রচনার শতবর্ষে অসাধারণ এই নাটকের আন্তর্জাতিক আবেদনের কাহিনি শোনালেন। শিশুদের জয়গানে মুখর কিছু অসাধারণ সাহিত্য-নমুনার অন্যতম এই ডাকঘর—যেখানে আমরা পাই অমলকে। ভাবনায় গভীর সুকথিত আলোচনাটি সমবেত প্রাক্তনীদের মন ভরিয়ে দিয়েছে। নবীন-প্রবীণের মিলিত অংশগ্রহণে নাচ-গান-আবৃত্তির আসর জমে ওঠে। ঝর্ণা সিংহ পেশ করেন গত আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব (৭৮ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সুধীরা ভবনে চা-জলখাবারের আয়োজনে অংশ নেবার পর সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১৯ আগস্ট রবিবার সকাল ৯টায় আধ্যাত্মিক শিবিরের সূচনা হয়। সংসদ সভাপতি শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্য প্রস্তাবনায় শিবিরের আয়োজন এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধ-শতবর্ষ পালন উপলক্ষে এবারের শিবিরের মূল বিষয় ছিল 'বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ভাবনা'। প্রথম পর্বের সবচেয়ে মনোজ্ঞ অংশ ছিল প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা মাতাজির মূল্যবান এবং একইসঙ্গে অত্যন্ত মনোগ্রাহী আলোচনা। জলযোগ ও চা-পানের বিরতির পর দ্বিতীয় পর্বের বক্তা ছিলেন প্রব্রাজিকা সচ্চিদ্প্রাণা মাতাজি। শ্রদ্ধেয়া প্রাক্তনী অনিতাদির রচিত একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশন করলেন প্রাক্তনীরা। সবশেষে সমবেতভাবে শান্তি বচন উচ্চারণের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শিবিরের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে প্রাক্তনীরা মিলিত হয়েছিলেন নভেম্বর মাসের ৪ তারিখের অপরাহ্ণে। ২০১২ সালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রীদের প্রাক্তনী সংসদে বরণ করে নেওয়া হয়। ঐ দিন সদ্য প্রাক্তনীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। অনিতাদির স্বাগত ভাষণ এবং সিস্টার স্মরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়ে তা এগিয়ে গেল অন্যান্যদের নাচ-গান-আবৃত্তি ও ভ্রমণের বর্ণনায়। আয়-ব্যয়ের হিসেব শোনান মৌমন দত্ত। প্রাক্তনী সংসদের কার্যনির্বাহী সমিতির পক্ষ থেকে বার্ষিক সদস্য চাঁদা ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করার প্রস্তাব সভায় রাখা হয়। প্রস্তাবে অধিকাংশ সদস্যের সম্মতি পাওয়া গেছে। সবশেষে বিজয়ার মুখমিষ্টিতে সম্মেলনের সমাপ্তি।

প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে কিছু জরুরি কথা সদস্যদের জানানো প্রয়োজন। প্রাক্তনী সংসদের হিসেব-সংক্রান্ত পরীক্ষিত তথ্যাদি (Audit Report) সরকারি দপ্তরে নির্দিষ্ট সময়ে জমা পড়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি শ্রীযুক্ত সৌমেন নন্দী মহাশয়ের (এ. সি. এ. চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট - নন্দী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ৭সি কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১) ওপর ন্যস্ত করে আমরা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করি। সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে বছরের পর বছর শ্রী নন্দী এই কাজটি করে দিয়ে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সারা বছর সংসদের কাজ নিয়মিত সম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়েছে — সাধারণ সভা - ২টি, কার্যনির্বাহী সমিতির সভা - ৬টা, বিশেষ বর্ধিত সভা - ৭টি।

একটি বিষয় আবারও স্মরণ করব। আমাদের স্কুলের উঠোন ও ঠাকুরদালানটি আমাদের বড়ো প্রিয়; অনুষ্ঠানগুলোতে আমরা তাই এখানেই মিলিত হতে চাই। ফলে স্কুলের কার্যাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের উৎসবের দিনগুলি স্থির করতে হয়। স্কুলের স্বার্থই প্রাক্তনীদের প্রথম বিবেচনা, তাই অনেকটা পিছিয়ে এবারের পুনর্মিলন উৎসব আমাদের ফেব্রুয়ারি মাসে করতে হল। প্রাক্তনীদের সহযোগিতায় কোনো ঘাটতি হবে না বলেই বিশ্বাস রাখি।

RAMAKRISHNA SARADA MISSION SISTER NIBEDITA GIRLS' SCHOOL ALUMNAE ASSOCIATION

5, Nivedita Lane, Kolkata-700 003

Registration No. S/IL/8344 of 2001-2002 dated 06.03.2002 (Registered under the West Bengal Societies Act. 1961)

MEMORANDUM

1. The name of the Association is RAMAKRISHNA SARADA MISSION SISTER NIVEDITA GIRLS' SCHOOL ALUMNAE ASSOCIATION, CALCUTTA.

2. The Registered Office of the Association is situated at 5, Nivedita Lane, Calcutta-700 003, in the state of West Bengal.

3. The aims and objects of the Association are as follows :

(a) to foster the dreams of Sister Nivedita, especially those, regarding women education for the overall personality development and improvement in the condition of the womenfolk keeping harmony with the indigenous Indian tradition and culture.

(b) to promote fellowfeeling and fraternity amongst the ex-students of Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School, hereinafter called as THE SCHOOL, as well as between the past and the present students and also the staff-members of the school.

(c) to organize social functions, conferences, debates, seminars, symposia etc. from time to time and to hold the Annual Re-union of the members of the Association.

(d) to promote cultural and intellectual activities in the widest import.

(e) to provide such relief as is possible within the limits of its own resources to the ex-students who are in the need of help on account of age, sickness, indigence or other causes.

(f) to publish periodicals, pamphlets, souvenirs or books for diffusion of knowledge or for promoting any of the objects of the Assoication.

(g) to initiate or assist in the initiation or performance of all activities which would be directly or indirectly beneficial to the School and/or to the students, ex-students and the members of the staff, past or present, and in upholding the tradition of excellence of **Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School, Kolkata.**

(h) to maintain and/or assist the School in maintaining proper Register of ex-students and of former teachers of the School, AND

(i) generally to undertake all activities necessary or expedient for carrying out the objects of the Association, not provided herein in the previous clauses.

4. Provided further that without prejudice to the generality of the above, for the purpose of carrying out of the said objects effectively, the Association shall have the powers, subject to and in accordance with the provisions of the West Bengal Societies Registration Act, 1961 & the Rules framed thereunder and also the Regulations of the Associations :

(a) to realize from its own members Life Membership fees or Annual subscriptions as the case may be and also to accept donations, grants or gifts, if any, from its members and non-members alike,

(b) to build up a General Fund in the name and for the purposes of the Association in such a manner, utilizing such sources, as may from time to time, be deemed fit and effective,

(c) i) to take on tenancy, lease or license or as gift or as donation, any land and/or building, for any period as is deemed necessary to carry out its activities effectively,

ii) to acquire, by purchase or by construction, any immovable property, with fund especially raised for this purpose,

iii) to acquire, hold, accept as gift, purchase any other asset which is required and can be utilized by the Association for its purpose,

(d) to receive advertisements for its journals and/or souvenirs and to realize money on that account.

(e) to accept the management of any trust, fund or endowment in which the Association may be interested and/or which is beneficial to the interest of the students of Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School, e.g. where the object of such trust, funds or endowments happen to be introduction of Scholarship to students of the School on stipulated terms, grant of award/medal to students, past and/or present, of the School for specific achievements, out of income derived there from, these schemes may be considered for acceptance provided the Association shall not have to incur high expenses in this regard.

5. The property and income of the Association shall be applied solely for the fulfillment of the objects of the Association and no part thereof shall be divided or distributed by way of dividend, bonus or otherwise, provided that nothing stated hereinbefore shall prevent the Association from remunerating a member of the Association for any professional services rendered by her to the Association or in connection therewith or for any duty especially entrusted to her by the Association or the Executive Committee.

6. In the event of dissolution of the Association its net assets, remaining after the payment of all debts and liabilities, shall be dealt with in the same manner, laid down in Section 27 of the West Bengal Societies Registration Act, 1961 and no part thereof shall be paid to or distributed in any way/form, among the members of the Association.

RAMAKRISHNA SARADA MISSION SISTER NIBEDITA GIRLS' SCHOOL ALUMNAE ASSOCIATION

EXECUTIVE COMMITTEE 2010-2013

President
Namita Bhattacharya
Ex. Sl. Grade Lecturer, (Pol. Sc.)
RKSM Vivekananda Vidyabhavan Kolkata

44/6, B.T. Road
Kolkata - 700 050
Phone : 2546 0865, 98306 13288

Secretary
Kakali De Joarder
Retired Teacher
RKSM Sister Nivedita Girls' School

H-2/226, S. S. Township
Kolkata - 700 061
Phone : 2452 0342, 98300 35557

Assistant Secretary
Soma De Joarder
Teacher,
RKSM Sister Nivedita Girls' School

H-2/226, S. S. Township
Kolkata - 700 061
Phone : 2452 0342, 98309 97895

Treasurer
Jharna Sinha
Lecturer (Math.) North Calcutta Polytechnic

30, Surya Sen Street
Kolkata - 700 009 Phone : 2219 6240, 98319 85034

Assistant Treasurer
Mouman Dutta
Asst. (Cash & Accounts) SBI

Pushpananda Apartment
276/6 Nagendranath Road, Nagerbazar, Kolkata - 700 055
Phone : 98311 18984

Members (from Academic Section)

Krishna Dhar
Retiered Programme Officer
SSEP, CMDA

EE-156/7, Salt Lake
Bidhannagar, Kolkata - 700 091
Phone : 2337 8414 ; 99034 93733

Puspa Paul
Home Maker

73/6, Beniatola Street
Kolkata - 700 005 Phone : 2543 3812

Saswati Banerjee
Teacher, Holi Child Institution
Kolkata

EE-106, Sector II, Salt Lake
Kolkata - 700 091
Phone : 2337 9804 ; 98302 39960

Bijoy Lakshmi Das Singer	P-3, Raja Rajkrishna Street, Kolkata 700 006 Phone : 2530 2475 ; 94326 42875
Supriya Pal Home Maker	46/C/46/4, Biplabi Barin Ghosh Sarani Kolkata - 700 054 Phone : 94336 25390
Aditi Bose Home Maker	'ASHIRBAD' House, Garia Station Road West Balia, Kolkata - 700 084 Phone : 2462 8105, 98041 34564
Manjusri Mukherjee Home Maker	16, Nivedita Lane Baghbazar, Kolkata - 700 003 Phone : 9163662406
Piyali Saha Biswas Asst. Manager Customer Care Consim Infor Pvt. Ltd.	12P/1C, Paikpara Road, Kolkata - 700 037 Phone :98368 03109
Ranjita Saha Asst. Teacher (Geo.) Chaumoha High School (H.S.)	P-166, Bidhan Nagar Road CIT Sch. VII - M, Kolkata - 700 054 Phone : 9836757605
Debtusi Misra Part Time Lecturer (Beng.) Prasanta Chandra Mahalanabish Mahavidyalay	35/2, Nawab Addul Latif Street, Kolkata - 700 056 Phone : 9433741287

Members (from Industrial Section)

Kalyani Banerjee Teacher, RKSM Sister Nivedita Girls' School, Kolkata	F/E 5/1/1, Biddasagar Pally Kolkata -700 059 Phone : 92318 14992
Shamali Ray Home Maker	45 S. K. Deb Road Kolkata - 700 048 Phone : 9804520530
Sipra Dutta Entrepreneur	Vidyasagar Pally, Sodepur Manik Danga Road, North 24 Pgrs. Kolkata - 700 111

Slave of the body, slave of the mind, slave of the world, slave of a good word, slave of a bad word, slave of passion, slave of happiness, slave of life, slave of death, slave of everything! This slavery has to be broken.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৫৮)

Slave of the body, slave of the mind, slave of the world, slave of a good word, slave of a bad word, slave of passion, slave of happiness, slave of life, slave of death, slave of everything! This slavery has to be broken.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৬৪)

দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই হল আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ ভালোভাবে যত্ন নিচ্ছে ততদিন যতই রাজনৈতিক আন্দোলন করা হোক না কেন, কিছুতেই কিছু হবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৬৪)

I look behind and after

and find that all is right

In my deepest sorrows

There is a soul of light.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রীবৃন্দ

(১৯৭০)

If you do not raise the women, who are the living embodiment of the Devine Mother, don't think that you have any other way to rise."

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৭৫)

Hindustan had become free, Pakistan had become independent soon after its inception but man was still slave in both these countries – slave of prejudice – slave of religious fanaticism – slave of barbarity and inhumanity.

Saadat Hasan Manto

প্রাক্তন ছাত্রীবৃন্দ

(১৯৭৫)

**Liberation means entire freedom –
freedom from the bondage of good,
as well as from the bondage of evil.**

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রীবৃন্দ

(১৯৮২)

The only religion that ought to be taught is the religion of fearlessness.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৬০)

Old rituals must be rejected and new ones substituted.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৬৪)

Educate your women first and leave them to themselves; then they will tell you what reforms are necessary for them.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৬৪)

We are lamps, and our burning is what we call life.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রীবৃন্দ

(১৯৬৫)

আজ জগৎ যোড়া যশের বোঝা লইয়া সংসার ক্ষেত্রে যে 'স্টার থিয়েটারে'-র নাম উন্নত বক্ষে অবস্থান করিতেছে সেও একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে বিশেষ আত্মীয় বলিয়া মনে করিত। এক্ষণে শত আরাধনায় যাঁহাদের একবার মাত্র দেখা পাওয়া যায় না, এমন দিন গিয়াছে যে এই অতি ক্ষুদ্রশক্তি আত্মত্যাগ না করিলে হয়ত কোন আঁধারের কোণে তাঁহাদের পড়িয়া থাকিতে হইত।

নটী বিনোদিনী

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৬৯)

If you find my stories dirty, the society you are living in is dirty. With my stories I only expose the truth.

Saadat Hasan Manto

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৭৩)

মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৭৮)

কিছু নষ্ট কোরো না। ধ্বংসবাদী সংস্কারকরা জগতের কোন উপকারই করতে পারে না। কোন কিছু একেবারে ভেঙো না, একেবারে ধূলিসাৎ কোরো না, বরং গঠন করো। যদি পার সাহায্য করো; যদি না পার, হাত গুটিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, এবং যেমন চলছে চলতে দাও। যদি সাহায্য করতে না পার, অনিষ্ট কোরো না।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৭৯)

বুদ্ধির দোষে ও অদৃষ্টের ফেরে সময় সময় আত্মরক্ষা না করিতে পারিলেও কখনও অভিনয় কার্য্যে অমনোযোগী হই নাই, অমনোযোগী হইবার ক্ষমতাও ছিল না। অভিনয়ই আমার সার সম্পৎ ছিল।

নটী বিনোদিনী

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৮৪)

A writer picks up his pen only when his sensibility is hurt.

Saadat Hasan Manto

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৮৪)

It is in love that religion exists and not in ceremony.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৮৬)

The greatest sin is to think yourself weak.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৮৯)

The greatest truths are the simplest things in the world, simple as your own existence.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(১৯৯৩)

If superstition enters, the brain is gone.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(২০০০)

This world is too full of blustering talk. We want a little more earnest work, and less talk.

Swami Vivekananda

প্রাক্তন ছাত্রী

(২০০১)

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

শিল্প বিভাগ